KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৮ বি, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলকাতা
Collection KLMLGK	Publisher দিলীপকুমার সান্যাল
Title সমসাময়িক	Size 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 1/1 1/2	Year of Publication আষাঢ়, ১৩৮৭ আশ্বিন, ১৩৮৭
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : ধীরেন্দ্র চৌধুরী,	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমসাময়িক

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আষাঢ় ১৩৪৭

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত ● শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল পরিচালিত

কলিকাতা, ৬ বি, বকুলবাগান রো (ভবানীপুর)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মণীশ ঘটকের কবিতার বই

শি লা লি পি

"Moody, Rebellious and Romantic"

Hiren Mukherjee, *in The Statesman.*

"The fierceness of the passion is held strongly in leash, but the throb of the fast-beating heart is visible through the lines."

The Bengali P. E. N. News, *January 1940.*

"In his love poems, there is a singular intensity & bitterness, which is neither the fashionable boredom, nor the worked up frenzy of falsely primitive sensuality—the poet has lived and experienced before he has caught the fugitive sensory impressions."

Prof. Bimalaprasad Mukherjee,

in The Amritabazar Patrika.

দাম দুই টাকা

নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায় :—

কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ। অধ্যাপক অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৮৮এ রাসবিহারী এভেনিউ। গ্রন্থকার, ৫।৬ সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট। সমসাময়িক কার্য্যালয়, ৬বি বকুলবাগান রো। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, ও গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং, কলেজ স্কোয়ার, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়।

সমসাময়িক

ত্রৈমাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৭ | প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় আলোচনা—		১ক
শেষ অভিসার (কবিতা)—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
যুদ্ধের "নূতন" টেক্‌নিক্—	শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী	৫
তত্ত্ববিচার—	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য	১৭
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার—	শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল	২৯
হাতী-শিকারে অভিজ্ঞতা—	মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা	৩৬
সভ্যতা—	ক্লাইভ বেল	৫১
বাংলার আধুনিক পলিটিক্‌সের নিষ্ফলতা—	গোপাল হালদার	৬২
মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি—	শ্রীত্রিদিব চৌধুরী	৭৫
ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে—	"একেলা"	৯৫
কবিতা (১) পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে	—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১০
(২) কেন বৃথা স্বপ্ন-সাধ	—শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল	১১১
(৩) "আমার মরণে হবে"	—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১১২
(৪) বৈশাখী পূর্ণিমা	—শ্রীকানাই সামন্ত	১১৩
পুস্তক সমালোচনা		
(১) বাংলাভাষা পরিচয়	—শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী	১১৪
(২) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	—শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস	১২২

এই সংখ্যায় প্রকাশিত সব প্রবন্ধের স্বত্ব লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

বিজ্ঞপ্তি

লেখক ও পাঠকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে সম্পাদক বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। সব রচনাই দৈর্ঘ্যে এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মত ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনাদি যথাসম্ভব সযত্নে রক্ষিত হইলেও সম্পাদক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট না পাঠাইলে রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না। রচনা ও রচনাসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা।

আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ হইলেও বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। মূল্য ও অর্ডার কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৬ বি, বকুল বাগান রো,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
সমসাময়িক।

সম্পাদকীয় আলোচনা

নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইলে লোকের মনে উহার উদ্দেশ্য ও 'পলিসি' সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই দুই প্রসঙ্গেই আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবু রেওয়াজ অনুযায়ী জবাবদিহির মত একটা কিছু খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সাময়িক পত্র নানা উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথমত উহার লক্ষ্য হইতে পারে ব্যবসা করিয়া লাভ। আমাদের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা বিষয়বুদ্ধির নিতান্তই বিরোধী হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে বাক্যব্যয় অনাবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে, কোন বিশিষ্ট মত প্রচারের জন্য। ইহাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কারণ 'সমসাময়িক'-কে কোন একটা বিশেষ মতের মুখপাত্র করা আমাদের অনভিপ্রেত। এই ভাবে মত প্রচার করিতে গেলে সকলের আগে প্রচারের যোগ্য একটা মত আবিষ্কার করা প্রয়োজন কিংবা প্রয়োজন অন্য কাহারও মতের কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ; এবং সর্ব্বোপরি প্রয়োজন এই স্থিরবিশ্বাসে উপনীত হইবার যে, আমাদের আবিষ্কৃত বা অবলম্বিত মতই সত্য, অন্য মত মিথ্যা। আমরা এই তিনটি কাজের কোনটিই সমাধা করিতে পারি নাই, হয়ত বা করা সমীচীনও মনে করি না। আমরা লেখকদিগকে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের ও সত্য অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। যদি তাঁহাদের মত যুক্তি ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র আমাদের অভিমত হইতে বিভিন্ন বলিয়া উহার প্রকাশে বাধা দিতে অগ্রসর হইব না।

এ কথা আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয় যে, এই মানসিক 'লেসে ফেয়ার' হাল-ফ্যাশানের বিরোধী। ইহাও আমরা স্বীকার করি, অবস্থাবিশেষে অগণিত ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্কোচ করিয়া বিশেষ একটা মতকে জনসমষ্টির ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার তাগিদ থাকিতে পারে, অন্তত এই স্বাধীনতাসঙ্কোচের সমর্থক একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করা অতি সহজ কাজ, বর্ত্তমানকালে ফ্যাশানসঙ্গতও বটে। কিন্তু যেখানেই এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে, সেখানেই উহা ঘটিয়াছে লৌকিক প্রয়োজনের খাতিরে, জাতীয় বা সমাজগত কোন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য। সুতরাং উহা কর্ম্মের আনুষঙ্গিক, জ্ঞানের নয়। আমরা জ্ঞানযোগের নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসার মধ্যে

আপাততঃ নিজেদের আবদ্ধ রাখিব। এই নিষ্কাম জ্ঞানযোগের সত্যকার অস্তিত্ব বা মূল্য আছে কি নাই সেই প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক বাড়াইব না।

ইহা ছাড়া একটি বিশেষ মত বা কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া ফেলিলে মানবজীবনের বহুমুখীনতার যে সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমরা স্বাভাবিক বা কল্যাণকর বলিয়া মনে করি না। একে বাঙালী-জীবনে বৈচিত্র্য ও প্রাণবানতার অত্যন্ত অভাব, উহাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া কি লাভ? আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন নীরসতা শুধু একটি ঝোঁককেই উগ্রতর ও তিক্ততর করিয়া তুলিলে ঘুচিবে না। যে কোন কারণেই হউক আমাদের জীবনপ্রবাহ মোটের উপর একটি মাত্র খাতে বহিতেছে, উহাতেও স্রোতের বেগ মন্দীভূত। এই খাতটি শুকাইয়া গেলে আমাদের কি অবস্থা হইবে, তাহা নদীমাতৃক বাঙালীর অন্তত ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

পত্রিকা প্রকাশের দুইটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছি। আর একটি উদ্দেশ্যের কথাও বলা আবশ্যক। আর্থিক লাভ ও মতপ্রকাশ ছাড়া আত্মধ্যানের আকাঙ্ক্ষাও মানুষকে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী করিতে পারে। আত্মধ্যান মানবের একটা সুপরিচিত বৃত্তি। পত্রিকা প্রকাশ বা অন্য কোন কার্য্যকলাপকে দর্পণের মত সম্মুখে ধরিয়া উহার ভিতরে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইবার ইচ্ছা,—আমাদের মানসিক চেহারা কত সুন্দর! অপর হইতে কত স্বতন্ত্র! ইতরজন হইতে কত বিশিষ্ট! এই ধরণের কল্পনা করিবার মোহ আমাদের সকলেরই আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা ইহাকে ব্যাধি বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমাদের পক্ষে এই সহজাত বৃত্তি কাটাইয়া উঠা দুরূহ। সুতরাং এ বিষয়ে একেবারে মোহমুক্ত হইবার দম্ভ করিব না। তবে ব্যক্তি বা দল হিসাবে আমাদের আত্ম প্রত্যয় ও সাহস অত্যন্ত কম, সেজন্য আমাদের পক্ষে একটা মানসিক বা শারীরিক ভঙ্গী লইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

* * * *

উপরে 'সমসাময়িকে'র মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সম্পাদক এ বিষয়ে অনেকটা পক্ষপাতশূন্যতার দাবী করিতে পারেন। কারণ এই পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প ও উদ্যম তাঁহার নিকট হইতে আসে নাই, আসিয়াছে অন্য কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী যুবকের নিকট হইতে। সম্পাদকের ব্যক্তিগত উৎসাহের অপেক্ষা রাখিলে হয়ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া অসহযোগ করিয়া সাহিত্য সেবার আগ্রহে বাধা সৃষ্টি করা সম্পাদকের নিকট সঙ্গত মনে হয়

নাই। যাঁহারা 'সমসাময়িক' প্রকাশে ও প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতিভূ হিসাবে এই পত্রিকা পরিচালন সম্পাদকের সম্পাদকীয় দায়িত্ব। পরিচালন নীতি সম্বন্ধে তিনি যে আভাষ পাইয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শুনিতে পাই, বর্ত্তমান যুগে নাকি আত্ম-সম্মোহনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। করিয়া থাকিলে পরম আশ্বাসের কথা। কিন্তু আত্ম-সম্মোহনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে বুদ্ধিকে সজীব রাখিতে হয় না কি? এই বুদ্ধিকে অকলুষ রাখা কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। যাহাকে আমরা রসোপলব্ধি বলি, তাহা জীবনকে সম্ভোগ করিবারই নামান্তর। জীবনে যাহা কিছু আমরা সম্ভোগ করি, বুদ্ধি দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের রসতৃপ্তি পূর্ণতর হয়।

"মনোজগতে সশুদ্ধ হওয়াই মানবের কাম্য। বুদ্ধিহীনতাই বর্ব্বরতা। বুদ্ধির সাধনাই মানস জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা জানি, বুদ্ধি সত্ত্বেও আমরা জৈব নিয়মশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমাদের বিশেষ গর্ব্ব, আমরা অতি সাধারণ মানুষ। তাই সমস্ত লৌকিক প্রয়োজনকে সহজে স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। খাইবার সময় মুখব্যাদান করিতে হয় বলিয়া আহারের কথা ভাবিতে লজ্জিত হওয়া শুরুচির পরিচায়ক হইতে পারে, সুবুদ্ধির নহে। যাহা কিছু আমাদের জীবনের অখণ্ড রসোপলব্ধি উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। আমাদের একমাত্র বর্জ্জনীয় নির্ব্বুদ্ধি অহঙ্কার, অন্ধ আত্মসম্মোহন। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রার্থনা—

'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত্'।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে বুদ্ধি ত মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতন হওয়ার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক, মানুষের বহু মানসিক বৃত্তির সবগুলির অনুশীলন সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সমানভাবে হয় না। আজ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বুদ্ধিবৃত্তি একটু কোণঠাসা হইয়া রহিয়াছে, উহার স্থান অধিকার করিয়াছে বিচারহীন আবেগ বা ততোধিক বিচারহীন গতানুগতিকতা। আমাদের দেশেও এই ঢেউ পূর্ণরূপেই আসিয়াছে। এক প্রকার অভ্যাসের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার অভ্যাস, এক গুরুর বদলে অন্য গুরু, এক বীজমন্ত্রের স্থলে অন্য বীজমন্ত্র গ্রহণ করিলেই লোক বিচারবুদ্ধিতে অগ্রসর হয় না। আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্ম্মে স্থির বুদ্ধি ও শান্ত ধ্যানের একান্ত অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বুদ্ধিকে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা নিতান্ত কর্ম্মহীনের খেয়াল বলিয়া পরিগণিত না-ও হইতে পারে।

* * *

এতক্ষণ নিজেদের কথা বলিলাম, এইবারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে গিয়া বাংলা সাময়িক পত্রের পক্ষে প্রথমেই বাংলা ভাষার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণীয়। এই কর্ত্তব্যপালন আজিকার দিনে কিরূপ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। জার্ম্মানদের দ্বারা প্যারিস অধিকারের সংবাদ যেদিন কলিকাতা আসিয়া পৌঁছে সেদিন ট্রামে যাইতেছি, এমন সময়ে সাহেবী পোষাক পরা একটি বাঙালী ভদ্রলোক পাশে আসিয়া বসিলেন। আমার হাতে একখানি খবরের কাগজ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সৌজন্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্যারিস কি পড়ে গেছে?" প্রশ্নটা কি তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেও আমি কিছুক্ষণ অজ্ঞতার ভাণ করিয়া রহিলাম, আর তিনি কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "প্যারিস কি পড়ে গেছে?" "প্যারিস কি পড়ে গেছে?" আমি তখন না বলিয়া পারিলাম না যে, তাঁহার প্রশ্নের তাৎপর্য্য আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন তিনি ইংরাজীতে বলিলেন—"ফল্ অফ্ প্যারিস, ফল্ অফ্ প্যারিস।" আমি উত্তর দিলাম, প্রশ্নটা এইভাবে গোড়াতে জিজ্ঞাসা করিলেই হইত, তিনি যখন সাহেব তখন বাংলা বলিবার কষ্টচেষ্টার কোনই দরকার ছিল না। ইহাতে ভদ্রলোক তর্ক তুলিবার চেষ্টা করিলেন; সাহেবের সহিত বাংলা ভাষা লইয়া বিতণ্ডা করিতে প্রস্তুত নই শুধু এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া রহিলাম। কিন্তু অভদ্রতা করিলে কি হইবে? নামিবার পূর্ব্বে ভদ্রলোক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলেন যে, দিনে দিনে বাংলা ভাষার পরিবর্ত্তন হইতেছে, পুরাতন আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, এখনও আমাকে অনেক নূতন জিনিষ শিখিতে হইবে। বৌবাজারের মোড়ে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। দেখিলাম সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র স্বরূপ বাংলা দৈনিকে বড় হেড লাইন—"প্যারিস মহানগরীর পতন।"

এই একটি ঘটনা হইতেই বিবেচক পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমানকালে বাংলা ভাষার বাঙালীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্ত সহজ কাজ নয়। চণ্ডীদাস হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও বাংলা ভাষা যে নিজস্ব ঠাট বজায় রাখিতে পারিয়াছে উহা আর কতদিন টিকিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাংলা ভাষাকে রাখিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে নামিলেও

কোন পক্ষের জয় হইবে কোন পক্ষের পরাজয় হইবে তাহা অনিশ্চিত। তবু 'সমসাময়িকে' বাংলা ভাষা যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহৃত হইবে। সফল হইব কিনা বলিতে পারি না, ইংরেজীতে অনুবাদ না করিয়াও যাহাতে উহার বক্তব্য বোধগম্য হয় সে চেষ্টাও আমরা করিব। আশা করি এই ব্যাপারে পাঠক ও লেখকগণ আমাদের সহায়তা করিবেন।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উত্থাপন না করিয়া উপায় নাই। পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, বর্ত্তমান সংখ্যা 'সমসাময়িকে'র প্রত্যেকটি রচনাই তথাকথিত সাধু ভাষায় লেখা। ইহা কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয়। এ বিষয়ে আমাদের বাঁধাবাধি নাই এমন কি মন স্থিরও করিতে পারি নাই। তবে আমাদের মত এই যে, শীঘ্রই এই প্রশ্নের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লিখিত ভাষার ক্রিয়ারূপের স্থলে মৌখিক ভাষার ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করিলে বাংলা গদ্যের ছন্দ ও ধ্বনি এত বিভিন্ন হইয়া যায় যে, দুই নৌকায় পা দিয়া থাকা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দুই পথের একটি পথ একদিন না একদিন আমাদিগকে ছাড়িতে হইবেই। যদি মৌখিক ভাষার সহিত পুস্তকগত ভাষার বিরোধ একমাত্র ভাষার ব্যাপারই হইত তাহা হইলে হয়ত উহা মিটিতে বেশী সময় লাগিত না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যাঁহারা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহারা যে তৎসম শব্দ কম ব্যবহার করেন বা রচনাভঙ্গীতে বেশী প্রাঞ্জল তাহা নয়; বরঞ্চ কয়েকজন 'কচ্ছি-খাচ্ছি'-পন্থী যে পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন ও রচনারীতিতে যে অষ্টাবক্রত্ব প্রদর্শন করেন উহা সাধারণ সাধুভাষা-পন্থীদের নিকট ভীতিজনক। আসল ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই, সাধু ভাষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদের নিকট মৌখিক ভাষার ভঙ্গী বাচালতার সূচনা করে, তেমনই মৌখিক ভাষার অনুরাগী ব্যক্তিদের নিকট সাধু ভাষার ভঙ্গী সেকেলে, রক্ষণশীল, আড়ষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়। এই দুই প্রকারের রচনাভঙ্গী ক্রমে ক্রমে দুই বিপরীত মানসিক ধর্ম্মের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপে একটা বৃহত্তর মানসক্ষেত্রে পৌঁছিয়া গেলে মৌখিক ও কথিত ভাষার বিবাদভঞ্জন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

* * * *

ভাষা ভিন্ন অন্য ব্যাপারেও আমরা দোটানায় পড়িয়াছি। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্যের কথা বলিব না, কারণ কার্য্যত এ জিনিষটার মীমাংসা অনেক ব্যাপারে হইয়া গিয়াছে, এবং যেখানে হয় নাই সেখানেও শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই টানাটানি আমাদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে অন্য একটা দোটানা আমাদের সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে একটা বড় রকমের বাধা সৃষ্টি করিতেছে। সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান যাহার কথাই ধরি না কেন, তখনই প্রশ্ন উঠে এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিতে গিয়া আমরা কাহাকে অবলম্বন করিব—বাংলা দেশকে না ভারতবর্ষকে? সংস্কৃতির অবলম্বন ভাষা, সুতরাং আমাদের পক্ষে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালী হিসাবেই সংস্কৃতির আসরে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয়তার দিক হইতে আমরা ভারতীয়, অন্তত ভারতীয় ঐক্যের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সুতরাং যখনই রাষ্ট্রীয় সত্তার প্রশ্ন উঠে তখন আমরা ভাষার সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে চলিয়া যাই। আমাদের জাতীয়তার পরিধি ও সংস্কৃতির পরিধি যে এক নয় তাহা আমাদের পক্ষে এক মহা সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সঙ্কটের প্রকৃত রূপ কি তাহা আমাদের শিক্ষাসমস্যার বিশ্লেষণ করিয়া আরও একটু বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হওয়াতে আমরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছি; আশা করিতেছি, যে শ্রম ও সময় এতদিন একটা বিদেশী ভাষার চর্চ্চায় ব্যয়িত হইত তাহা অন্যান্য বিষয়ের অনুশীলনে নিযুক্ত করিলে আমাদের বালক ও যুবকদের মননশক্তির অধিকতর বিকাশ হইবে, তাহাদের জ্ঞানের পরিমাণও বাড়িবে। যদি বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব না হয় (হইবে কি হইবে না এখনও বলা সম্ভব নয়) তাহা হইলে নূতন নিয়মের ফলে আমাদের যুবকদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুরুতর সমস্যাও দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতে এই সকল বালকদিগের শিক্ষার বাহন কি হইবে? যদি স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা-দান কেবলমাত্র সাময়িক সুবিধার জন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিবার এই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে যে, যতদিন না বালকেরা ইংরেজী ভাষায় যথোপযুক্ত ব্যুৎপন্ন হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাহাদের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা হইবে না, কিন্তু তাহাদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান একটু অগ্রসর হইলেই তাহাদিগকে বাংলা ভাষার স্তর হইতে ইংরেজী ভাষার স্তরে উন্নীত করা হইবে, তাহা হইলে বিশেষ গণ্ডগোলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, বাঙালীর সন্তান বাংলা ভাষার ভিতর দিয়াই আজীবন জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করিবে, বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবে, সুতরাং ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত বাংলাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রচেষ্টা সফল হওয়া

মাত্র শিক্ষার অন্য স্তরেও বাংলার প্রবর্ত্তন করা হইবে, তাহা হইলে বলা আবশ্যক ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্করক্ষা অত্যন্ত জটিল ও কষ্টকর হইয়া উঠাই সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী বা ইটালীর কথা তুলিলে চলিবে না, কারণ আমরা যে ভাবে ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত, যে ভাবে ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী, ইউরোপের কোন দেশ অন্য দেশের সহিত সেই ভাবে যুক্ত নয়। সেখানে প্রত্যেকটি দেশের অবিমিশ্র রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া উহাদের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য সম্ভব, যদিও বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃতির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য কোথাও নাই। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য আমাদের মতই থাকুক না কেন, উহা কখনই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যে পরিণত হইবে না; হওয়া উচিতও নয়। তবে আমরা কি করিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রদেশকে অবলম্বন করিয়াই দাঁড়াইব?

এই সমস্যাটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যদি আমরা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আদর্শের বা অভিরুচির কথা ধরি। আমি ঐতিহাসিক গবেষণা করিতে চাই, আপনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে চান, আর একজন সাহিত্য লইয়া থাকিতে চান। কিন্তু এই সকল কার্য্যকলাপের লক্ষ্য মুখ্যত কাহারা? শুধু বাঙালী, না অন্যেও? মুস্কিল এই দাঁড়াইয়াছে, যদি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একেবারে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে আমাদের কার্য্যকলাপকে শুধু বাংলার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারিব না। অথচ ভাষার পরিধি আমাদিগকে এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, কারণ আমরা এখনও এত বড় একটা জাতি হই নাই বা এত বড় একটা সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতে পারি নাই যাহাতে অন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের রচনার অনুবাদ করিবে। বিশ্বের দরবারে যদি আমাদিগকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় বলিয়া পরিগণিত করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে ভাষার সীমা ছাড়িয়া বাহির হইতে হইবে, আর যদি আমরা ভাষা লইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদিগকে সংস্কৃতির উচ্চতম আদর্শ ছাড়িতে হইবে। আমাদের ভাষার গণ্ডী ও সংস্কৃতির আদর্শের মধ্যে যে বিরোধ তাহার মীমাংসা কি করিয়া হইবে তাহার কোন ইঙ্গিত আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই।

* * * *

উপসংহারে আজিকার বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের কথা স্মরণ করিব। যুদ্ধ যে কারণেই বাধিয়া থাকুক, বর্ত্তমানে এই জিনিষটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার ফলাফলের সহিত মানবজাতির ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে দিন হইতে

আমরা জ্ঞানলাভ করিয়াছি ততদিনের মধ্যে বিশ্বসমাজের ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ অনুভব করি নাই, গত যুদ্ধের সময়েও নয়। কিন্তু তিন মাস পরে অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে সে সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত অনুমান করাও আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইতেছে, আমাদের চক্ষের সম্মুখে যেন কুহেলী দুলিতেছে, দৃষ্টি তাঁহাকে ভেদ করিতে পারিতেছে না। যাঁহারা মনে করেন এই অনিশ্চয়তা ও সঙ্কট আমাদের স্পর্শ করিবে না, তাঁহাদিগকে অন্ধ বলিলে উপযুক্ত হইবে না, কারণ অন্ধেরও দৃষ্টি ভিন্ন অন্য অনুভূতি থাকে। মঙ্গলের জন্যই হউক আর অমঙ্গলের জন্যই হউক বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের জাতিগত জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবেই। অথচ আমাদের চারিপাশে এই অনুভূতির একান্ত অভাব প্রতি পলে অনুভব করিতেছি। আমরা যুদ্ধ লইয়া আলোচনা ও তর্ক, এমন কি দলাদলিও করিতেছি বটে, কিন্তু এই আলোচনা ও তর্ক যে স্তরের তাহা সাধারণত রেসের ঘোড়া, ফুটবল খেলোয়াড়, ও সিনেমার অভিনেত্রীর গুণাগুণ বিচারেই আবদ্ধ থাকা উচিত। আমি মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তিকে হিসাবের মধ্যে টানিতেছি না, বলিতেছি শিক্ষিত সাধারণের কথা। ইঁহাদের নিকট বর্ত্তমান যুদ্ধ এখনও তামাসা বা হুজুগ ভিন্ন অন্য ব্যাপারে পরিণত হয় নাই।

ইহার উপর আবার নিরপেক্ষভাবে সকলকে দোষী করিবার, ইউরোপীয় সভ্যতাকে হীন ও অবসাদগ্রস্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার, ইউরোপীয় মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবর্জ্জিত বলিয়া অবজ্ঞা করিবার অতি সহজ অভ্যাস আমরা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। এই অভ্যাস অবশ্য অনেকদিনকার, কিন্তু ইউরোপে কোন মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলেই উহা উগ্র হইয়া দেখা দেয়, সবলের দুর্দ্দৈবে দুর্ব্বলের আনন্দ একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। গত যুদ্ধের সময়েও আমরা উহা দেখিয়াছিলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ উহাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। আজ আবার উহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা যথার্থ ও মহত্তর কথা কেহ বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

"মৃত্যু ভেদ করি'
দুলিয়া চলেচে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।

টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেচে আদেশ—
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি'
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠিচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,

বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ!
রাখ নিন্দাবাণী, রাখ আপন সাযুজ্য-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে!"

শেষ অভিসার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশে ঈশানকোণে মসীপুঞ্জ মেঘ।
আসন্ন ঝড়ের বেগ
স্তব্ধ রহে অরণ্যের ডালে ডালে
যেন সে বাদুড় পালে পালে।
নিষ্কম্পপল্লবঘন মৌনরাশি
শিকার প্রত্যাশী
বাঘের মতন আছে থাবা পেতে,
রন্ধ্রহীন আঁধারেতে।
ঝাঁকে ঝাঁক
উড়িয়া চলেছে কাক
আতঙ্ক বহন করি উদ্বিগ্ন ডানার পরে।
যেন কোন্ ভেঙেপড়া লোকান্তরে
ছিন্ন ছিন্ন রাত্রিখণ্ড চলিয়াছে উড়ে
উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতায় শূন্যতল জুড়ে।

দুর্যোগের ভূমিকায় তুমি আজ কোথা হতে এলে
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে।
জন্মের আরম্ভপ্রান্তে একদিন
এসেছিলে অম্লান নবীন
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
এনেছিলে আষাঢ়ের প্রথম যূথিকা
অনির্বচনীয় তুমি।

মর্মতলে উঠিলে কুসুমি'
অসীম বিস্ময়মাঝে ; নাহি জানি এলে কোথা হতে
অদৃশ্য আলোক হতে দৃষ্টির আলোতে।
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা,
আজ আসিতেছ তুমি ; ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব,
কী তাহার ভাষা অভিনব।

আসিছ যে পথ বেয়ে সেদিনের চেনা পথ এ কি।
এ যে দেখি
কোথাও বা ক্ষীণ তার রেখা,
কোথাও চিহ্নের সূত্র লেশমাত্র নাহি যায় দেখা
ডালিতে এনেছ ফুল স্মৃত বিস্মৃত,
কিছু বা অপরিচিত।
হে দূতী এনেছ আজ গন্ধে তব যে ঋতুর বাণী
নাম তার নাহি জানি।
মৃত্যু অন্ধকারময়
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আসন্ন তাহার পরিচয়।
তারি বরমাল্যখানি পরাইয়া দাও মোর গলে
স্তিমিত নক্ষত্র এই নীরবের সভাঙ্গনতলে ;
এই তব শেষ অভিসারে
ধরণীর পারে
মিলন ঘটায়ে যাও অজানার সাথে
অন্তহীন রাতে॥

মংপু
১০ই বৈশাখ ১৩৪৭

যুদ্ধের "নূতন" টেক্‌নিক্

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

গত দুই তিন মাসের মধ্যে জার্ম্মান সেনাবাহিনীর অসামান্য সাফল্যে, বিশেষত ফ্রান্সের মত দেশের পরাজয়ে, সাধারণের মনে একটা বড় রকমের ধাক্কা লাগিয়াছে। ফলে, যুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁহারা কখনও বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না, তাঁহারাও যুদ্ধের "নূতন" টেক্‌নিকের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকেরই মনে ধারণা জন্মিয়াছে, জার্ম্মানী যুদ্ধের এমন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে বা এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে যাহার কথা পূর্ব্বে জানা ছিল না, এমন কি পূর্ব্বে ধারণা বা অনুমান করা সম্ভবও ছিল না। এই বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা অনেক হইয়াছে, এখন দেখা দরকার আসল ব্যাপার কি ?

প্রথমেই কতকগুলি অনাবশ্যক ও অবান্তর যুক্তি ছাঁটিয়া ফেলা প্রয়োজন। যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই উহা যে নূতন টেক্‌নিকের জন্যই হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবার কারণ নাই। যুদ্ধজয় যেমন নূতন রীতি, কৌশল ও অস্ত্রের দ্বারা হইতে পারে তেমনই সেনাপতিদের দক্ষতা, সৈন্যসামন্তের সংখ্যাধিক্য, অস্ত্রের প্রাচুর্য্য, দীর্ঘকালব্যাপী আয়োজন, এই সকল কারণেও হইতে পারে। এমন কি জয়ী পক্ষের বিশেষ কোন কৃতিত্ব না থাকিলেও অপর পক্ষের ভুল, অকর্ম্মণ্যতা, শৈথিল্য ইত্যাদি জয়ের হেতু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ১৮৭০ সনে ফ্রান্স যখন জার্ম্মানীর হাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় তখন নূতন টেক্‌নিকের প্রশ্ন উঠে নাই, উঠিয়াছিল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, তাঁহার মন্ত্রিবর্গ, ও তাঁহার সেনাপতিদের অক্ষমতার কথা। মল্‌ট্‌কে এবং রোণের চেষ্টায় ও নেতৃত্বে জার্ম্মান সেনাবাহিনী সে যুগে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ও যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এক ব্যক্তিগত সাহস ভিন্ন অন্য সব দিকেই জার্ম্মান বাহিনী সেই যুদ্ধে নিজের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিল। তবু কিন্তু তখন নূতন টেক্‌নিকের সংবাদ এমন করিয়া শোনা যায় নাই।

তারপর ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক, দ্রুত যুদ্ধজয়ের দ্বারাও নূতন টেক্‌নিকের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। বর্ত্তমান যুদ্ধে পোল্যাণ্ড, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স যে এত অল্পসময়ের মধ্যে বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছে ইহা অনেকের কাছে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছে। সামরিক ইতিহাস কিন্তু এই ধারণার

সমর্থন করে না। ইহার পূর্ব্বেও অল্পসময়ের মধ্যে দেশ জয় ও অধিকার ইউরোপে অনেকবার হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পিশগ্রু ১৭৯৪ সনের ২৮শে ডিসেম্বর মাজ নদী পার হইয়া পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারী তারিখে আমষ্টারডাম অধিকার করেন; নেপোলিয়ন ১৮০৫ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাইন নদী পার হন ও সমস্ত দক্ষিণ জর্ম্মানী জয় করিয়া ১৪ই নভেম্বর ভিয়েনা অধিকার করিয়া ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বোহেমিয়ার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন; ১৮০৬ সনে নেপোলিয়ন দিন কুড়ির মধ্যে প্রশিয়া জয় করেন; ১৮৬৬ সনে অষ্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাহা নামে 'সাত-সপ্তাহের যুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত হইলেও অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটে দিন ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে; ১৮৭০ সনের ফ্রাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ৬ষ্ঠা আগষ্ট ও তৃতীয় নেপোলিয়ন আত্মসমর্পণ করেন ১লা সেপ্টেম্বর। মনে রাখিতে হইবে সে যুগে রেল মোটরকার ইত্যাদি ছিল না; সৈন্যগণকে মুখ্যত পায়ে হাঁটিয়াই চলিতে হইত। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, অল্পদিনের মধ্যে দেশজয় বর্ত্তমান যুদ্ধেই প্রথম দেখা যায় নাই। বরঞ্চ বলা উচিত, অল্পদিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলাই রণনীতির সাধারণ নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম যদি ঘটে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অবস্থা অল্পবিস্তর অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপরে যাহা লেখা হইল তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন জার্ম্মান সেনানায়ক বা সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব অস্বীকার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত তিন মাসের মধ্যে সামরিক ব্যাপারে জার্ম্মানী অসাধারণ দক্ষতা ও অভিনবত্বের পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু এই দক্ষতা ও অভিনবত্ব যে ধরণের বলিয়া আমরা কল্পনা করি প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই ধরণের নয়। রামায়ণ মহাভারত পড়ার ফলে আমাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, যুদ্ধজয়ের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র, দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র বা ঐ শ্রেণীর গুপ্ত অস্ত্রের প্রয়োজন। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত এই প্রকারের বহু ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রহ্ম-কৌশল আমরা জার্ম্মান জেনারেল ষ্টাফের উপর আরোপ করিয়াছি। সেজন্য আজ এই কথাটা বলিলে কেহ হয়ত বিশ্বাস করিবেন না যে, এই যুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই যাহার কথা পূর্ব্বে জানা ছিল না, বা যাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হয় নাই। অথচ একটি দুইটি ব্যতিক্রম ছাড়া এই কথাটা নির্জ্জলা সত্য। ইহাও বলা আবশ্যক, যে দুই একটি ব্যতিক্রমের কথা বলা হইল উহাদের অভিনবত্ব মূলগত নয়, কেবল মাত্র টেক্‌নিকাল উন্নতিতে। এই বিষয়টার ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

নূতন অস্ত্র সম্বন্ধে জনরব উঠিয়াছে কিয়দংশে আমাদের অস্পষ্ট ধারণা হইতে কিয়দংশে হিটলারের কয়েকটি কথার জন্য। গত বৎসরের ১৯শে সেপ্টেম্বর হিটলার রাইখ্‌সিগে একটি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার এক স্থলে তিনি বলেন, "সে মুহূর্ত্ত আসিতে পারে যখন আমরা এমন একটি অস্ত্র ব্যবহার করিব যাহা এখন পর্য্যন্ত অজানা এবং যাহার দ্বারা আমরা নিজেরা আক্রান্ত হইতে পারিব না।" এই বক্তৃতার পর হইতেই হিটলারের গোপন অস্ত্র সম্বন্ধে, শুধু আমাদের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কল্পনা অসম্ভবরকম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

আসলে কিন্তু হিটলারের মনে কি ছিল তাহা বলা কঠিন। এমনও হইতে পারে, শুধু ভয়প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তবে কথার ভঙ্গী হইতে মনে হয় তিনি তখন বাণিজ্য জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে, এরকম কোন অস্ত্রের কথা ভাবিতেছিলেন। কারণ অজানা অস্ত্র জানা হইয়া যাইতে বেশী সময় লাগে না। তখন উভয় পক্ষই উহা ব্যবহার করিতে পারে, যেমন গত যুদ্ধে গ্যাসের বেলায় দেখা গিয়াছিল। যদি কেহ বলে, কোন অস্ত্র তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, তখন বুঝিতে হইবে এই অস্ত্রের লক্ষীভূত হইবার মত বস্তু তাহার নাই। যুদ্ধের পর হইতেই পৃথিবীর প্রধান সমুদ্র পথে জার্ম্মানীর বাণিজ্যপোত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অথচ গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্যপোত যথেষ্ট সংখ্যায় যাতায়াত করিতেছিল। সুতরাং বাণিজ্যপোত আক্রমণ করিবার জন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করিলে জার্ম্মানীর অপেক্ষা গ্রেট ব্রিটেনেরই বেশী ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল।

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, তখন হয়ত হিটলার ম্যাগ্নেটিক মাইনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এইটিই বর্ত্তমান যুদ্ধের একমাত্র অস্ত্র যাহার অস্তিত্বের কথা পূর্ব্বে জানা ছিল না। কিন্তু এই নূতনত্বের পরিমাণ কতটুকু? মাইন বহুলপরিমাণে গত যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ম্যাগ্নেটিক মাইন সেই মাইনের প্রকারভেদ মাত্র, প্রয়োগরীতিতে একটু বিভিন্ন। সাধারণ মাইন ধাক্কা না লাগিলে ফাটে না; ম্যাগ্নেটিক লৌহনির্ম্মিত কোন জিনিষ নিকটে আসিলেই ফাটিয়া যায়। সাধারণ মাইন তার দিয়া সমুদ্রতলে নোঙর করিতে থাকে, সুতরাং তার কাটিয়া দিতে পারিলেই উহা উপরে উঠিয়া আসে এবং উহাকে নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়; ম্যাগ্নেটিক মাইন সমুদ্রতলে ডুবিয়া থাকে, সেজন্য উহা কোথায় রহিয়াছে বাহির করা কঠিন। এই নূতন ধরণের মাইন সাধারণ মাইনেরই আরও একটু বিপজ্জনক সংস্করণ মাত্র। দুইয়ের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধে অন্য যে সকল অভিনবত্ব দেখা গিয়াছে তাহাও এই ধরণের—

ট্যাঙ্কের পাত যতটুকু মোটা হইবে হিসাব ছিল তাহার অপেক্ষা বেশী মোটা, এরোপ্লেনের পেট্রোল ট্যাঙ্কে এমন ব্যবস্থা রহিয়াছে যাহাতে গুলি লাগিলে পেট্রোল বাহির হইয়া না পড়ে, প্যারাশুটে দোষত্রুটি যাহা ছিল তাহা সংশোধিত হইয়াছে, ইত্যাদি। এই সকলে অভিনবত্বকে টেকনিক্যাল উন্নতি বলা উচিত। ট্যাঙ্ক গত যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইদানীং নানাদিকে উহার উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে। এরোপ্লেন চালকের আত্মরক্ষার জন্য প্যারাশুট অনেক কাল ধরিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে হইতে শত্রুপক্ষের লাইনের পিছনে সৈন্য নামাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার জন্য উহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। রুশিয়ায় ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তবে বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানী প্যারাশুটকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহারে লাগাইয়াছে।

তবে এখন পর্য্যন্ত কোন নূতন অস্ত্র দেখা দিয়া না থাকিলেও ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে। এই নূতনত্ব জার্ম্মানীর দিক হইতে আসিবার যতটুকু সম্ভাবনা, গ্রেট বৃটেনের দিক হইতে আসিবারও ততটুকু সম্ভাবনা। গত যুদ্ধে গ্যাসের ব্যবহার জার্ম্মানরা প্রবর্ত্তন করে, ট্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন করে ইংরেজরা। কিন্তু নূতন অস্ত্র আসিলেও উহা এমন কিছু হইবে না যাহার সহিত পূর্ব্বেকার যুদ্ধোপকরণের কোন যোগসূত্র নাই। বিজ্ঞানে যেমন এক তথ্য হইতে অন্য তথ্য আবিষ্কৃত হয়, জীবজগতে যেমন নানাজাতির প্রাণীর মধ্যে একটা সূত্র ও সাদৃশ্য থাকে, সামাজিক পরিবর্ত্তনে যেমন আমরা যাহা আছে তাহা হইতেই নূতন অবস্থায় যাই, তেমনই যুদ্ধের বেলাতেও এই ক্রমবিকাশের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অস্ত্রের ক্ষেত্রে এই ক্রমবিকাশ কি ভাবে হয় তাহার একটু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর যুদ্ধরীতির কথা একটু বলা আবশ্যক।

জার্ম্মান সেনাপতিগণ এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে যদি আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া থাকেন তাহা হইলে অশ্রুতপূর্ব্ব কিছু করেন নাই। প্রতিপক্ষের অপ্রত্যাশিত বা অচিন্তিত কৌশল অবলম্বন যুদ্ধ জিতিবার একটা প্রকৃষ্ট ও সনাতন উপায়। ইহার আবার প্রকারভেদ আছে। প্রথমত, যে জায়গায় বা যে সময়ে অপর পক্ষ আক্রমণ মোটেই আশঙ্কা করে না, সেখানে বা সে সময়ে আক্রমণ। দ্বিতীয়ত, এমন কোন পদ্ধতিতে আক্রমণ যাহাতে অন্য পক্ষ অভ্যস্ত নয়। তৃতীয়ত, এমন কোন অস্ত্র ব্যবহার যাহা শত্রুপক্ষের নাই এবং যাহার প্রতিষেধের ব্যবস্থা সে করিতে পারে নাই। ইহাদের প্রথমটিকে সামরিক পরিভাষায় 'ষ্ট্র্যাটেজিক সারপ্রাইজ' বলা হয়; দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি 'পরস্পরসম্পৃক্ত বলিয়া মিলিতভাবে 'ট্যাক্‌টিক্যাল সারপ্রাইজ' নামে পরিচিত। প্রত্যেক সেনানায়কই প্রতিপক্ষকে

বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য কোন না কোন দিক হইতে, সম্ভব হইলে সব দিক হইতেই, অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই প্রচেষ্টার মধ্যে একেবারে অভাবনীয় অভিনবত্ব কিছু থাকিতে পারে না। অন্তত ইউরোপীয় সামরিক শাস্ত্রে বা সামরিক ইতিহাসে গত চারশত বৎসরের মধ্যে এ রকম মৌলিকতা কিছু দেখা যায় নাই। সর্ব্বদাই প্রচলিত ধারা হইতে যুক্তিপরম্পরায় নূতন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ হইয়াছে। কখনও পরিবর্ত্তন দ্রুত ও বেশী হইয়াছে, কখনও মন্থরগতিতে ও অল্প পরিমাণে হইয়াছে। সমরনীতির পরিবর্ত্তন কেন দ্রুত হয় কেন মন্থর হয় তাহার ঐতিহাসিক কারণ আছে। এই স্থলে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শুধু মনে রাখা আবশ্যক যে, ইউরোপের ইতিহাসে সমরনীতির অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারা সুস্পষ্টভাবে ধরিতে পারা যায়। নেপোলিয়নের যুদ্ধরীতির সহিত ফ্রেডারিকের যুদ্ধরীতির, নেপোলিয়নের যুদ্ধনীতির সহিত গিবেয়ার, দ্যু তেল, বুর্সে প্রভৃতির মতামতের ও শিক্ষার, কিংবা নেপোলিয়নের সহিত ক্লোজেভিৎসের ও মল্‌ট্‌কের তুলনা করিলেই ইহা সপ্রমাণ হয়।

ইউরোপে যুদ্ধরীতির বিকাশ কিরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য শ্লীফেনেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাউণ্ট শ্লীফেন বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মান সেনানায়কদের গুরু বলিয়া স্বীকৃত; তাঁহার মতামত ও নির্দ্দেশের অনুসরণ আজ পর্য্যন্তও জার্ম্মান জেনারেল ষ্টাফ করিয়া থাকেন। এই শ্লীফেন যে যুদ্ধকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সংঘটিত হয় ২১৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে। ইহা বিখ্যাত ক্যানীর যুদ্ধ—যে যুদ্ধে হ্যানিবাল রোমান সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। শ্লীফেনের শিক্ষার ফলে জার্ম্মান সামরিক রীতি ও নীতির সহিত 'ক্যানী' এই কথাটি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, ১৯১৪ সনের টানেনবার্গের যুদ্ধ সম্বন্ধে উহার উল্লেখ হইয়াছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ড জয় সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন কি যে মাসে বেলজিয়ম ও ফ্রান্সে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে উহার মধ্যেও, শ্লীফেন ক্যানীকে যে পদ্ধতি প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন তাহার আভাষ স্পষ্ট বিদ্যমান।

জার্ম্মান যুদ্ধনীতির প্রকৃত অভিনবত্ব কি তাহা নির্ণয়ের ঠিক পথ আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে নাই। সেজন্য ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা বলার আবশ্যক ছিল। এইবারে আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতে পারে। গত দুই তিন মাসের মধ্যে যে জিনিষটা সামরিক জগৎকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা এই—জার্ম্মান সেনাবাহিনী আবার 'অফেন্সিভ' (আক্রমণ) ও 'ওয়ার অফ্ মুভমেণ্ট'কে

(সচল যুদ্ধকে) কার্য্যক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সামরিক নীতি কখনই 'অফেন্সিভ'কে অস্বীকার করে নাই। ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধনীতিতেই নির্দ্দেশ আছে, নিরুদ্যম আত্মরক্ষা বা 'প্যাসিভ ডিফেন্সে'র দ্বারা জয়লাভ সম্ভব নয়, জয়ের জন্য প্রয়োজন 'অফেন্সিভে'র। যেমন, ব্রিটিশ ফিল্ড সার্ভিস রেগুলেশুনস্-এর নূতনতম সংস্করণে আছে—"প্যাসিভ ডিফেন্সের দ্বারা জয়লাভ করা যায় না; অবস্থা অনুকূল হইলেই অফেন্সিভের প্রচেষ্টা করা উচিত, ইহাই যুদ্ধ নীতি।" কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই 'অফেন্সিভ' কতটা কার্য্যকরী করা যাইবে সে বিষয়ে সামরিক নেতৃবর্গ ও লেখকদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যুদ্ধে 'অফেন্সিভে'র শক্তি বেশী কি, 'ডিফেন্সিভে'র শক্তি বেশী, ইহা একটি পুরাতন প্রশ্ন। জয়লাভের জন্য 'অফেন্সিভ' অপরিহার্য্য, এই নীতি সর্ব্বস্বীকৃত হইলেও পূর্ব্বেও কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'ডিফেন্সে'রই শক্তি বেশী, অর্থাৎ 'অফেন্সিভে'র অপেক্ষা 'ডিফেন্সে'র দ্বারাই প্রতিপক্ষের বল বেশী ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা। এই অভিমত গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রায় একটা স্থিরবিশ্বাসেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সামরিক থিওরীর দিক হইতে ১৯২০ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত কালকে 'ডিফেন্সিভ' নীতির প্রাধান্যের কাল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

'অফেন্সিভ' সম্বন্ধে এই দ্বিধা এবং 'ডিফেন্সিভ' সম্বন্ধে আস্থা ইউরোপের সৈনিক মহলের সর্ব্বত্রই দেখা দিয়াছিল। উহা ফ্রান্স বা গ্রেট ব্রটেনের সমরনীতিকে যতটুকু প্রভাবান্বিত করিয়াছিল জার্ম্মান নীতিকেও তদপেক্ষা কম করে নাই। ১৯২৫ সনে মেজর সোল্ডান নামে একজন জার্ম্মান সেনানায়ক "ডেয়ার মেন্স্ উন্ট ডি শ্লাখ্ট্ ডেয়ার ৎস্কুন্ফ্ট" (ভবিষ্যতের মানুষ ও যুদ্ধ) এই নাম দিয়া একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, "বর্ত্তমান যুগের সেনাবাহিনীগুলি একটি অপরটিকে আর পরাজিত করিতে পারিবে না।" স্বয়ং লুডেনডর্ফ ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত "ডেয়ার টোটালে ক্রিগ্" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, "সেনাবাহিনীর 'মাস-মবিলাইজেশুন,' পরাজিত সেনাবাহিনীর 'রিজার্ভে'র পরিমাণ, ও রেলপথের উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্য (যাহার জন্য দ্রুত সৈন্য চলাচল সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে), এই সকল বিবেচনা করিলে মনে হয় না যে, প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধ জিতিলেই চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব।" গত যুদ্ধে জেনারেল ভেৎসেল লুডেনডর্ফ ও হিণ্ডেনবুর্গের সহকর্ম্মী ছিলেন। যুদ্ধের প্ল্যান করিবার ভার তাঁহার উপর ছিল, এবং তিনিই ১৯১৮ সনের ২১শে মার্চ্চ তারিখের প্রবল আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে জার্ম্মানীর প্রধান সামরিক পত্রিকা "মিলিটের ভোখেনব্লাটে"র সম্পাদক ছিলেন।

এই জেনারেল ভেৎসেল ১৯৩৬ সনে লেখেন যে, "ছোট বড় সকল রাষ্ট্র নানা ধরণের দুর্গমালার দ্বারা শান্তির সময়েও যে ভাবে সীমান্তকে রক্ষা করিতেছে তাহাতে মনে হয় না যে, ভবিষ্যতে কোন দিন ১৯১৪ সনের যুদ্ধের মত সচল যুদ্ধ আবার সম্ভব হইবে।" "মিলিটের ভোখেনব্লাট" পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধেও বলা হইয়াছিল, আক্রমণ করিবার জন্য যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয় বর্ত্তমান যুগে তাহাদের খুবই উন্নতি হইয়া থাকিলেও সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার ব্যবস্থারও অনেক বেশী উৎকর্ষ হইয়াছে; বর্ত্তমানে অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিবার সম্ভাবনা আছে বলা চলে।

'অফেন্সিভ' ও 'ডিফেন্সিভে'র শ্রেষ্ঠত্ব ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই তর্কে 'ডিফেন্সিভে'র পক্ষে যাহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধ হয় সামরিক লেখক ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট। কি গত যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করিবার সময়ে, কি সেই যুদ্ধের নায়কদের কার্য্যকলাপ ও মতামতের সমালোচনা প্রসঙ্গে, কি বর্ত্তমান কালের সামরিক সমস্যার বিচারে, সর্ব্বত্রই তিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আর 'অফেন্সিভে'র স্থান নাই। লিডেল হার্ট শুধু যে 'অফেন্সিভে' আস্থাহীন তাহাই নয়, যাহা এতদিন যুদ্ধে 'জয়' বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে তাহাই আর সম্ভব বা কাম্য বলিয়া তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার নূতনতম পুস্তক, "দি ডিফেন্স অফ ব্রটেন"-এ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের কল্পনাকে মরীচিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধ 'জিতিবার' প্রচেষ্টাই অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত জয়রূপ মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন হইতেই আমাদের যুদ্ধে হারিবার বেশী সম্ভাবনা।" এই ব্যাপারে লিডেল হার্টের ব্যক্তিগত একটা পক্ষপাত যে আছে তাহা সত্য। এমন কি একজন ইংরেজ সামরিক সমালোচক তাঁহার মতামতকে "ফল্স্ ডক্‌ট্রিন" বা ভ্রান্ত মত বলিয়া তীব্র সমালোচনাও করিয়াছেন। তবু মোটের উপর এই কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা ও ব্যবস্থায় 'ডিফেন্সিভ' 'অফেন্সিভ'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের রক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ টিকিতে পারিবে না, হঠকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া আক্রমণ করিতে গেলে লোকক্ষয়ের জন্য পরাজয় হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

এই অভিমতের মূল কোথায় আবিষ্কার করিতে হইলে ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের প্রতি একটু দৃষ্টিনিক্ষেপ করা প্রয়োজন। সেই যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় পক্ষই আক্রমণ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। জার্ম্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য বেলজিয়মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে,

এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য ফরাসী জেনারেল ষ্টাফ নিজেদের উত্তর সীমান্তে আত্মরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন নাই। জার্ম্মান আক্রমণ যে বেলজিয়মের ভিতর দিয়া হইবে উহা যে তাঁহারা জানিতেন না এমন নয়, কিন্তু জানিয়াও ইচ্ছা করিয়াই উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার কারণ 'অফেন্সিভে' বিশ্বাস। ১৯১৪ সনের কিছুকাল আগে হইতে ফরাসী জেনারেল ষ্টাফের উপর কর্ণেল গ্রাঁমেজোঁ প্রমুখ কয়েকজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক নায়কের প্রভাব বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ষোল আনা 'অফেন্সিভে' বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহাদের উৎসাহ ও উগ্রতার জন্য অন্যেরা পরিহাস করিয়া তাঁহাদিগকে 'যুব-তুর্ক' বলিয়া অভিহিত করিতেন। জেনারেল মিশেল প্রথমে জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য উপযুক্ত 'ডিফেন্সিভে'র ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নব্য নেতাদের প্রতিকূলতায় তাঁহার প্ল্যান প্র ত্যাখ্যাত হয় ও সেই প্ল্যানের স্থলে সুপরিচিত প্ল্যান-১৭ ফরাসী সমরপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই শেষোক্ত প্ল্যানের মূল কথা এই ছিল যে, জার্ম্মানী যখন ফ্রান্সের বাম দিক আক্রমণ করিবে তখন আলসাস ও লোরেনের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে প্রতি-আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জার্ম্মান আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইতে বাধ্য। যে যুক্তির বলে ফরাসী সেনানায়কেরা এই পন্থতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই—প্রথমত, আমাকে কেহ যখন হাত বাড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করে তখন যদি আমি তাহার হাত ধরিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা না করিয়া সোজা টুঁটি চাপিয়া ধরি, তাহা হইলে হাত যেখানেই থাকুক না কেন আক্রমণকারী আমাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য; দ্বিতীয়ত, আত্মরক্ষা অপেক্ষা আক্রমণই ফরাসী জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব। ইঁহারা বলিতেন, ফরাসী চরিত্র ও মনোবৃত্তি যেরূপ তাহাতে তাহাকে শুধু আত্মরক্ষা করিতে বলিলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, তাহার তেজ ও শক্তির পূর্ণ প্রকাশ করিবার জন্য চাই আক্রমণ—আক্রমণেই তাহার অধিকতর উৎসাহ।

এই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্ল্যান-১৭ যে কার্য্যকরী হয় নাই তাহা সুবিদিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক মাসের মধ্যেই সীমান্তের যুদ্ধে প্ল্যান-১৭-এর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ওদিকে আক্রমণনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মান শ্লীফেন প্ল্যানও মার্ণের যুদ্ধে ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর পশ্চিম রণক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে ট্রেঞ্চের স্থিতিশীল যুদ্ধে পরিণত হইতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের এই নূতন অবস্থা দাঁড়াইবার পরও কোন পক্ষের সেনানায়কেরাই উহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, কাঁটা তার ও মেশিনগানের সম্মিলিত শক্তির পরিমাপ করিতে পারেন নাই। তাই প্রায় অভেদ্য ট্রেঞ্চ-লাইন আক্রমণ করিয়া অগণিত লোকক্ষয় করিয়াছিলেন।

জার্ম্মান পক্ষ হইতে ইপ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ, ভেরদাঁর যুদ্ধ, ১৯১৮ সনের মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত আক্রমণ এবং মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে সোম ও ইপ্রের তৃতীয় যুদ্ধ (যাহা পাঁশেনডেলের যুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল যুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল কিনা তাহা লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। কিন্তু সামরিক লেখক ও সমালোচকগণ মোটামুটিভাবে এই বিষয়ে একমত যে, এই সকল আক্রমণে লোকক্ষয় যাহা হইয়াছিল তাহার অনুপাতে ফললাভ হয় নাই। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, ট্রেঞ্চের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া পুরাতন ধরণের 'অফেন্সিভ' চালাইতে গিয়া সেনানায়কগণ দূরদৃষ্টি ও সচেতন বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

এই অভিজ্ঞতা হইতে যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে 'ডিফেন্সিভ' রণনীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই মত কেবলমাত্র থিওরীর ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে নাই, কার্য্যক্ষেত্রেও অনুসৃত হইয়াছিল। বিশেষভাবে ফ্রান্সের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে। ১৯১৯ সন হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের যুদ্ধনীতি ও রীতি প্রায় সর্ব্বাংশে 'ডিফেন্সিভ' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাজিনো লাইন ইহার প্রমাণ। কিন্তু তেমনই অন্যপক্ষে ওয়েষ্ট ওয়ালেরও উল্লেখ করিতে হয়। একমাত্র ফ্রান্সকেই 'ডিফেন্সিভ' রণনীতির জন্য দায়ী করা অসঙ্গত হইবে। কম হউক, বেশী হউক, এই রণনীতির প্রভাব ইউরোপের প্রত্যেকটি জেনারেল ষ্টাফই অনুভব করিয়াছে। ফলে সকলেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, স্থলযুদ্ধে আর আক্রমণ ও সচল অবস্থার পুনরভ্যুদয় হইবে না। জার্ম্মানী এই ধারণা দূর করিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অপ্রত্যাশিত হইলেও আজ 'অফেন্সিভ' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি করিয়া উহা সম্ভব হইল সে সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান আবশ্যক।

১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের পর রণনীতির ক্ষেত্রে 'ডিফেন্সিভে'র প্রাধান্য দেখা গেলেও সৈনিকমন কখনই ইহাতে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারে নাই। জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা সৈনিকমাত্রেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল, একমাত্র আক্রমণের দ্বারাই জয়লাভ সম্ভব এই ধারণাও বহুশত বৎসরের অভ্যাসের ফলে সৈনিকের মজ্জাগত। এই কারণে কেবলমাত্র গত যুদ্ধের চার বৎসর কালের অভিজ্ঞতার জন্য বহুদিনের সংস্কার ত্যাগ করা তাহার পক্ষে সহজ হয় নাই। অথচ তাহার পক্ষে এ কথাও অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই যে, বর্ত্তমানকালে 'অফেন্সিভে'র তুলনায় 'ডিফেন্সিভে'র শক্তি বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং প্রকৃত যুদ্ধজয় যাহাকে বলে তাহার আশা সুদূরপরাহত হইয়া গিয়াছে। তবে কি 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশ্যন' বা বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া তিলে

তিলে শক্তিক্ষয়কেই যুদ্ধবিস্তার ভবিষ্যৎ রূপ বলিয়া মানিতে হইবে? সৈনিকের নিকট এই চিন্তা অসহ্য, কারণ 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশন'কে সে বরাবরই হীনচক্ষে দেখিয়াছে। কোন যুদ্ধ 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশনে' পরিণত হইলে তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল বলিয়া সে জ্ঞান করিয়াছে। সত্য বটে হ্যানিবাল রোমের বিরুদ্ধে ইটালীতে থাকিয়া বার বৎসর কাল 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশন' চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার জয় হয় নাই; জয় হইয়াছিল রোমের, কারণ স্কিপিও আফ্রিকাগুসের নেতৃত্বে রোম ইটালীর যুদ্ধকে একপাশে রাখিয়া স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে। ইহাও ঠিক যে, ভার্জিনিয়ায় গ্রাণ্টকে 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশন' চালাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ফেডারেল দলের জয় হয় অন্য উপায়ে। গত যুদ্ধে 'ওয়ার অফ্ অ্যাট্রিশন'কে অতিক্রম করিয়া উঠা সম্ভব না হইলেও বহু সৈনিক ও সামরিক লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অগণিত প্রাণ বিসর্জন না দিয়া ডার্ডানেল্‌সে, কিংবা বল্কান পেনিনসুলায়, কিংবা প্যালেষ্টাইনে প্রথম হইতে যদি আরও উন্নমের সহিত যুদ্ধ চালান যাইত তাহা হইলে মীমাংসা আরও অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যাইত।

'ডিফেন্সিভ'কে যুদ্ধের একমাত্র রীতি বলিয়া মানিয়া লইতে সৈনিকদের এই যে অনিচ্ছা, ইহার বশে গত যুদ্ধের পর হইতেই সৈনিকমহলে জয়লাভের অন্য কি উপায় থাকিতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও বিচারবিতর্ক আরম্ভ হয়। এই আলোচনার প্রথম অবস্থায় স্থলযুদ্ধ, এমন কি কোন প্রকারের যুদ্ধ, হইতেই সুফল প্রত্যাশা করা হয় নাই, ভরসা স্থাপন করা হইয়াছিল অন্য জিনিষের উপর—প্রথমত, আর্থিক বা বাণিজ্যগত ক্ষতি সাধনে; দ্বিতীয়ত, প্রপাগ্যাণ্ডায়। ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধে মিত্রশক্তির ব্লকেড এবং মিত্রশক্তিবর্গ ও বলশেভিকদের প্রপাগ্যাণ্ডাতেই জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সকলের ধারণা জন্মিয়াছিল। সুতরাং সকলেরই নজর প্রথমে ঐ দিকে পড়িয়াছিল। তাহার পর দৃষ্টি যায় এরোপ্লেনের দিকে। এ বিষয়ে একজন ইটালীয়ান, জেনারেল ডুহে, যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সৈনিকমহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি বলেন, যুদ্ধ জিতিবার একমাত্র উপায় আকাশপথে 'অফেন্সিভ', সুতরাং অন্য সব দিকে কেবল মাত্র আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিয়া আকাশেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। ডুহের মতে স্থলসেনা বা নৌবহর যুদ্ধের গৌণ অস্ত্র মাত্র, একমাত্র বিমানই মুখ্য অস্ত্র। এই কারণে এরোপ্লেনকে স্থলসেনা বা নৌসেনার সহিত বাঁধিয়া না রাখিয়া স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্র ষ্ট্রাটেজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, ব্যবহার করিতে হইবে।

স্থলযুদ্ধের সংস্কার বা পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় কিনা সে বিষয়ে নজর পড়িল সর্ব্বশেষে। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে স্থলযুদ্ধের দুইটি সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছিল। উহার প্রথমটি এই—কি করিয়া শত্রুপক্ষের দুর্গমালা বা ট্রেঞ্চ লাইন ভেদ করা যায়? দ্বিতীয়টি—তারপর কি উপায়ে সেনাবাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত রাখা যায়। প্রথম সমস্যাসমাধানের পথ গত যুদ্ধেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যখন দেখা গেল, কাঁটা তারের বেড়া ও মেশিনগানের সারি ভেদ করিয়া সাধারণ পদাতিক আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তখন স্বভাবতই বর্ম্মাবৃত এমন একটা যানের কথা মনে হইল যাহা অন্যপক্ষের মেশিনগানের গুলিতে বাধা না পাইয়া কাঁটা তারের বেড়া ভাঙিয়া অসমান ভূমির উপর দিয়া যাইতে পারে। ফলে ট্যাঙ্কের উদ্ভব হইল। ১৯১৮ সনে জার্ম্মান হিণ্ডেনবুর্গ লাইন ট্যাঙ্কের সাহায্যেই ভেদ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে ইহাও দেখা গেল, ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য যে সব কামান, রাইফল, ও মেশিনগান নির্ম্মিত হইতেছে উহার দ্বারা ট্যাঙ্কের গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তখন ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়িয়া গেল। কিন্তু আবার তখনই ট্যাঙ্ককে উন্নত করিবার এবং আরও পুরু বর্ম্মে আবৃত করিবার ব্যবস্থা হইল। এমনই করিয়া ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্কের প্রতিষেধক অস্ত্রের মধ্যে একটা রেষারেষি চলিতে লাগিল, এবং এই টানাটানিতে ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোন মীমাংসা হইল না। বর্ত্তমান যুদ্ধ যখন বাধে তখনও এই তর্ক চলিতেছিল।

ইহার পর অগ্রগতি বজায় রাখিবার প্রশ্ন। গত যুদ্ধে দুই এক জায়গায় লাইন ভেদ করা সম্ভব হইলেও অগ্রগতি বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ আংশিকভাবে উপযুক্ত রিজার্ভের অভাব, আংশিকভাবে উপযুক্ত যানবাহন ও অস্ত্রের অভাব। পূর্ব্বে অশ্বারোহী সৈন্য এই কাজে নিযুক্ত করা হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে মেশিনগানের মুখে অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রেরণের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। সুতরাং অশ্বারোহী সৈন্যের মত দ্রুতগতি অথচ অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা আত্মরক্ষায় বেশী সক্ষম এমন কোন বাহিনীর প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু গত যুদ্ধে এই প্রকারের বাহিনী উদ্ভবের সময় হয় নাই, হইল যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে। তখন অশ্বারোহীর স্থলে আর্ম্মার্ড কার, মোটর সাইকেল, ছোট ট্যাঙ্ক ও লরী বাহিত সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হইল। ট্যাঙ্ক ট্রেঞ্চ লাইন ভাঙ্গিয়া দিবার পর অগ্রসর হইয়া যাওয়াই ইহাদের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু ইহার পরও আর একটা বড় সমস্যা রহিয়া গেল। বড় ট্যাঙ্কের দ্বারা ট্রেঞ্চ লাইন ভাঙ্গা সম্ভব বটে, আর্ম্মার্ড কার ইত্যাদি দ্বারা অগ্রসর হইয়া যাওয়াও সম্ভব, কিন্তু কামানের বিরুদ্ধে ইহারা আত্মরক্ষা করিবে কি করিয়া, কিংবা সম্মুখে

পদাতিক সৈন্য টেঞ্চ খুঁড়িয়া আবার যদি বসিয়া যাইবার অবকাশ পায় তাহা হইলে ইহারা কি করিবে? সুতরাং ইহাদিগকে সমানভাবে আর্টিলারীর দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। এখানেও প্রশ্ন, ভারী কামানকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর করান যায় কি করিয়া, অন্তত এমন কি ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে চলন্ত বাহিনী বোম্বার্ডমেণ্টের সাহায্য পায়? তখন দুই দিক হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইল। প্রথমত, সাধারণ কামানকে ট্যাঙ্ক ও ট্রাক্টরের উপরে চড়ান হইল। দ্বিতীয়ত, এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া আর্টিলারীর কাজ সমাধা করিবার কল্পনা হইল। এরোপ্লেনকে এই ভাবে স্থলসেনার সহিত যুক্ত করিয়া রাখা অনেকের মতের বিরোধী হইলেও দ্রুতগামী সৈন্যকে আর্টিলারীর সহায়তা দিবার এই একমাত্র উপায়, অন্য উপায় নাই। তাহা সকলের কাছেই প্রতিভাত হইবে। সুতরাং অগ্রগতির সহায়ক হিসাবে এরোপ্লেনের ব্যবহার প্রায় অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যুদ্ধকে সচল করিবার জন্য যে সকল উপায়ের উল্লেখ করা হইল তাহার আলোচনা ইউরোপের সৈনিকমহলে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে। কেহ বা এই সকল উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়াছেন, কেহ বা মনে করেন নাই। এই ব্যাপারে একই দেশে, একই সেনাবাহিনীতে মতের অনৈক্য দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানীতে বর্ত্তমানে যে সকল সেনানায়ক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের সকলেই প্রায় এই নূতন নীতিতে আস্থাবান। এই সকল নেতাদের মধ্যে কাইটেল, হালডার, ব্লাস্কোভিৎস, রাইশেনাউ, গুডেরিয়ান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনেতা হিটলার এবং তাঁহার সহকর্ম্মী গোয়েরিংও এই নূতন টেক্‌নিকে বিশ্বাসী। সুতরাং একদিকে সামরিক এবং অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ঐক্যতা সাধিত হওয়ায় জার্ম্মানীর রণনীতির সংস্কার ও সেনাবাহিনীর যথোচিত সংগঠন সম্ভব হইয়াছিল। এই সংস্কার ও সংগঠনের ফলেই জার্ম্মানীর অসাধারণ সাফল্য সম্ভব হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান যুদ্ধের নূতন টেক্‌নিক্।

তত্ত্ববিচার

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

তত্ত্ব ও সত্য

অমুক হওয়া উচিত এবং অমুক হইবে বা হইয়া আছে (কিন্তু আমি জানিতে পারি নাই), এই দুই কথার অর্থ এক নহে। ইহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যাহা হইবে বা হইয়া আছে তাহা সত্য পদার্থ। কিন্তু যাহার বিষয়ে 'হওয়া উচিত' বলিতেছি তাহা এখনও সত্যের পর্যায়ে আসে নাই—আসিলে 'হইবে' বা 'হইয়া আছে' বলিতাম। অবশ্য 'হইবে' বা 'হইয়া আছে' অর্থেও 'হওয়া উচিত' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু সেখানে প্রকৃত ঔচিত্যের অভিপ্রায় থাকে না, থাকে ঔচিত্যের ছায়ামাত্র। কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থকেই অনেক সময় সত্য বলিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া পরোক্ষ পদার্থমাত্রই 'হওয়া উচিত' আকারে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু ঐ প্রতিভান ভুল। সত্যত্ব প্রত্যক্ষরাজ্যে সীমাবদ্ধ নহে। যাহা হইয়াছিল, যাহা এখন জানিতেছি, যাহা হইবে এবং যাহা হইয়া আছে অথচ আমি জানি না—সকলই সমান সত্য। প্রকৃত উচিত-পদার্থ ইহাদের বাহিরে; কারণ তাহাকে সত্য বলি না, তাহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলিয়া বর্ণনা করি। এই উচিত-পদার্থের নামই তত্ত্ব বা আদর্শ। ইহার দ্বারাই বাস্তবের মূল্য বিচার করা হয়।

এই মূল্যবিচার মানুষের এক সহজ সংস্কার—ইহা কুসংস্কার নহে। আজকাল অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সত্যই আমাদের চরম কাম্য, ইহার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা কুশিক্ষার ফল মাত্র। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে এই উৎকট বাস্তববোধ একেবারে অবিরুদ্ধ। কারণ মুখে যতই অস্বীকার করুন তাঁহারা প্রকারান্তরে সত্যেরও অতীত আদর্শ মানিয়া লইয়াছেন। বাস্তবের মোহে বিভোর থাকিলেও তাঁহারা ঔচিত্যবোধ পরিত্যাগ করেন নাই; কারণ তাঁহারা এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে এতকাল লোকে যাহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলিয়া আসিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য 'হওয়া উচিত' নহে, সত্য 'হওয়া উচিত' কেবল তাহাই যাহা হইবে বা হইয়া আছে। অর্থাৎ তাঁহারা আদর্শ মাত্রকেই ভুল বলিতে পারেন নাই, একটি আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, এই মাত্র। অতএব আদর্শমাত্রই কুসংস্কারের ফল নহে।

বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, সর্বজনস্বীকৃতব্য এই আদর্শ বা তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়। সাধারণভাবে এই স্বরূপ নির্ণয় করিবার পর আমরা দেখাইব যে আদর্শের বিশেষধর্ম নিরূপণ আমাদের লৌকিক বুদ্ধিতে অসম্ভব। অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে যে নানা মতবাদ প্রচারিত আছে তাহাদের কোনটিকেই ভুল বলিবার অধিকার আমাদের নাই।

তত্ত্বের স্বরূপ

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে 'অমুক হওয়া উচিত' বলিলে অভিপ্রেত তত্ত্বটিকে সত্য বলিয়া এখনই গ্রহণ করিতে পারি না। তত্ত্বের স্বরূপ বিষয়ে ইহাই প্রথম তথ্য। দ্বিতীয় একটি তথ্যও অতি সহজে পাওয়া যায়। তাহা এই যে তত্ত্বটিকে সত্যের পর্যায়ে দাঁড় করাইতে হইবে, কারণ যাহা সত্য হওয়া উচিত তাহা এখনই সত্য না হইলেও সত্যত্বের দাবী করিতেছে—না হইলে তাহাকে 'সত্য' হওয়া উচিত বলিতেছি কেন?

এই দুই তথ্য কিন্তু এক দিক্ দিয়া পরস্পরবিরুদ্ধ। সত্য বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না সে কি করিয়া পরে সত্যের পর্যায়ে আসিবে? পরে যাহা সত্য হইবে তাহা তো সত্যই—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ইহাদের মধ্যে সত্য হিসাবে কোন তারতম্য নাই। সুতরাং যাহা সত্য হইবে তাহাকে সত্য বলিতে পারিতেছি না—এই কথার কোনও অর্থ নাই। অথচ এই প্রকার অনুভব যে হইতেছে সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় তথ্য দুইটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝা। প্রাকৃত অর্থ এই যে যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহাকে প্রাকৃত বুদ্ধিতেই সত্য বলিয়া পাই, কিন্তু তত্ত্বকে যখন 'সত্য হওয়া উচিত' বলি তখন এই সত্যত্ব অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিগম্য বলিয়া বুঝি। অতিপ্রাকৃত সত্যই প্রাকৃতবুদ্ধিতে তত্ত্ব বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন ইহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

আজকাল লোকে অতিপ্রাকৃত কোনও পদার্থ মানিতে চাহে না। কিন্তু ইহা না মানিলে ঔচিত্যানুভবের উপপত্তি হয় না। প্রাকৃতবুদ্ধিতে যাহা সত্য তাহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলিবার প্রয়োজন নাই; সত্য জানিতে পারিলে মানুষ আর কিছু জানিতে চাহে না। অথচ 'সত্য হওয়া উচিত' এই প্রকার অনুভব মানুষ-মাত্রেরই রহিয়াছে, এবং পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে ইহা যথার্থ অনুভব। সুতরাং অতিপ্রাকৃতের কথা না আনিয়া উপায় নাই।

আপত্তি হইতে পারে, অতি-আধুনিকেরা তো প্রাকৃত জগৎকেই 'সত্য হওয়া উচিত্' বলিতেছেন, সুতরাং অতিপ্রাকৃতের অবকাশ কোথায়? উত্তর এই যে প্রাকৃত জগৎকে যতক্ষণ সত্য বলা হইতেছে ততক্ষণ অবশ্য অতিপ্রাকৃতের অবকাশ নাই, কিন্তু যেইমাত্র ইহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলা হয় তখনই অতিপ্রাকৃতবুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করি, কারণ তাহা না হইলে ঔচিত্যানুভবের কোন অর্থই মিলে না। পুনরায় আপত্তি হইতে পারে—অতিপ্রাকৃতবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হইতেছে, অথচ একমাত্র প্রাকৃত পদার্থকেই 'সত্য হওয়া উচিত' বলা হইতেছে, ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? উত্তর এই যে কোনও জিনিষের সাহায্য লইলেই যে তাহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। ভুলের সাহায্যে কি সত্য নির্দেশ হয় না? অসৎ উপায়ে যদি সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে ভুলের সাহায্যে সত্য পাওয়া যাইবে না কেন?

যাহা হউক, তত্ত্ব বা আদর্শ প্রাকৃতবুদ্ধিতে সত্য নহে এবং অতিপ্রাকৃত-বুদ্ধির সাহায্যে ইহাকে সত্যের পর্যায়ে আনিতে হইবে। এখন দেখা যাউক এই দুইটি কথার প্রকৃত অর্থ কি?

প্রাকৃত বুদ্ধিতে সত্য নহে, ইহার অর্থ এমন নহে যে প্রাকৃতবুদ্ধিতে উহা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহার সত্যত্বের দাবী থাকিতে পারে না। 'সত্য নহে' শব্দের অর্থ 'সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না,' এই মাত্র। আপত্তি হইতে পারে, যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না তাহার মূল্য কি, তাহার আলোচনার কি প্রয়োজন? উত্তর এই যে একমাত্র মিথ্যাই মূল্যবিহীন, কিন্তু সত্য ও মিথ্যার মধ্যপথে এমন পদার্থ থাকিতে পারে যাহা একান্ত উপেক্ষণীয় নহে। প্রাকৃতবুদ্ধিতে তত্ত্ব বা আদর্শ এই প্রকারের অপরিহার্য পদার্থ। ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। ইহা না মানিয়া উপায় নাই, অথচ মানিতেছি বলিয়াই যে ইহা সত্য তাহাও নহে।

ইহা না মানিয়া উপায় নাই, অতএব ইহা সত্য—এই প্রকার অনুমান ভ্রমাত্মক। কারণ সত্যকে না মানিয়া উপায় নাই—এই কথা হইতে 'যাহা কিছু না মানিয়া উপায় নাই তাহাই সত্য' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আমাদের যে কোনও জ্ঞান অনুমানাদির নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য; কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি যে ঐ নিয়মগুলি মানিয়া চলিলেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে? মানিয়া চলিতে বাধ্য—এই কথার অর্থ মাত্র ইহাই যে ঐ সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবে না। কি করিলে জ্ঞান লাভ হইবে তাহার সূচনা ঐ কথায় নাই।

এখন দেখা যাউক, অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিতে তত্ত্বকে পর্যায়ে আনিতে হইবে—

এই কথারই বা অর্থ কি? অর্থ কি ইহাই যে, অপরিহার্য তত্ত্বকে সত্যত্ব প্রদান করিতে হইবে? অথবা প্রকৃত অর্থ এই যে, ইহার সত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে? অর্থাৎ তত্ত্ব বা আদর্শ যে সত্যত্বের দাবী করিতেছে, তাহা কর্মতন্ত্র না বস্তুতন্ত্র?

যাঁহারা ইহাকে কর্মতন্ত্র বলেন তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে অতিপ্রাকৃত-বুদ্ধি জ্ঞানাত্মক নহে, ইহা কর্মাত্মক। তাঁহাদের মতে 'হওয়া উচিত' কথাটির প্রকৃত অর্থ 'করা উচিত'; কর্ম বা প্রযত্নের কথা বাদ দিলে ঔচিত্যবোধই নিরর্থক। পূর্ব হইতে তত্ত্বের (অজ্ঞাত) সত্যত্ব থাকে না; কর্মাত্মক অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিতে 'সত্য' আদর্শ সৃষ্ট হয়। তবে এই সৃষ্টির বিশেষত্ব আছে। ইহা একান্ত নূতন পদার্থের সৃষ্টি নহে; সৃষ্ট পদার্থটি পূর্ব হইতে মাত্র অপরিহার্য রূপে ছিল। প্রাকৃতবুদ্ধির কোন সৃষ্টিই এ প্রকার নহে। সেখানে কতকগুলি সত্য পদার্থ পূর্ব হইতে থাকে, এবং তাহাদেরই সংমিশ্রণের ফলে নূতন এক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তত্ত্বের সৃষ্টি কিন্তু পূর্ব হইতে গৃহীত সত্য পদার্থের সংমিশ্রণে হয় না—ইহা একান্ত মৌলিক। পূর্বাঙ্গ তত্ত্বটি অপরিহার্য রূপে গৃহীত ছিল, এখন অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি দ্বারা তাহাকে সত্যত্ব প্রদান করা হইল।

যাঁহারা অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিকে জ্ঞানাত্মক বলেন তাঁহাদের নিকট 'সত্যের পর্যায়ে দাঁড় করান'র অর্থ 'আদর্শের সত্যত্ব জানিতে পারা'। অভিপ্রায় এই যে, যাহাকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলি তাহার সত্যত্ব পূর্ব হইতেই থাকে, কেবল প্রাকৃত-বুদ্ধিতে ঐ সত্যত্ব অনুভূত হইতে পারে না, জ্ঞানাত্মক অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিতে উহা পরিস্ফুট হয়। সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা সত্য আদর্শ সৃষ্ট হয় না। সাধন প্রক্রিয়া প্রাকৃতবুদ্ধির দোষ দূর করে মাত্র, এবং এই দোষ বিনিযুক্ত প্রাকৃত নামই অতি-প্রাকৃতবুদ্ধি। মলিনত্ব নিবন্ধন যে সত্যত্ব জ্ঞাত হইতে পারে নাই নির্মল অতি-প্রাকৃতবুদ্ধিতে তাহা আপনই প্রকাশিত হয়। এই মতে 'হওয়া উচিত' কথাটির অর্থ 'করা উচিত' নহে—ইহা পরিনিষ্ঠিত সত্যেরই পরিচায়ক।

ভক্তিপন্থীরা হয়ত এই মত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গের একান্ত বিরুদ্ধ নহে। ভক্তগণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াই কিছু নূতন কথা বলিতে চাহেন; আর যাঁহাদের জ্ঞানপন্থী বলা হয় তাঁহারা ঐ নূতন কথাটি না মানিয়া অন্য একটি নূতন কথা বলেন। ভক্তগণও স্বীকার করিবেন যে তাঁহাদের অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিতে চরমতত্ত্ব সৃষ্ট হয় না, উহা প্রকাশিত হয়। তাঁহারা কেবল নূতন এই কথা বলিতে চাহেন যে ঐ প্রকাশমাত্রে পরিতৃপ্তি আসে না, উহার পরও ভক্তি বা তজ্জাতীয় অনুভূতি দ্বারা প্রকাশমান সত্য আদর্শটির

নানাভাবে ধ্যান উপাসনাদি করা যায়। জ্ঞানপন্থীদের নূতন কথা এই যে চরমতত্ত্বের প্রকাশেই আমাদের চরম পরিতৃপ্তি।

অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি জ্ঞানাত্মক কি কর্মাত্মক—এই প্রশ্নের বিচার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কি করিয়া 'সত্য হওয়া উচিত' সত্যে পরিণত হইতে পারে তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য;

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। অতিপ্রাকৃত বিরোধী একদল দার্শনিক সত্য নির্ধারণের কোন প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। মাত্র অপরিহার্য পদার্থ লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ইহাকে যে আবার সত্যের পর্যায়ে আনিতে হইবে, এই অনুভবকে তাঁহারা একটি বিরাট কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করেন। এই প্রকার মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। বৈজ্ঞানিকগণ গাণিতিক ও অন্যবিধ অনুমানের সাহায্যে আজকাল এমন কতকগুলি তত্ত্বের কথা বলেন যাহারা লৌকিক সত্যের বিরুদ্ধ, অথচ ইহাদের অলৌকিক সত্য বলিতেও তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। ফলে তাঁহাদের শাস্ত্রটিকে অটুট রাখিতে হইলে সত্যকে বিসর্জন দিয়া অপরিহার্য তত্ত্বমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিতে তাঁহারা বাধ্য। আমরা কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ প্রতি অপরিহার্য তত্ত্বই 'হওয়া উচিত' বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং 'হওয়া উচিত' শব্দের অর্থই 'সত্য হওয়া উচিত'। 'হওয়া উচিত' বলিলেই একটি দাবী বুঝায়, এবং যদি এখানে সত্যের দাবী না থাকে তাহা হইলে আর কিসের দাবী থাকিতে পারে? ঔচিত্যবোধ-মাত্রই যে কুসংস্কার এ কথাও বলা যায় না—ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি।

যাহা হউক অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি মানিতেই হইবে, নচেৎ ঔচিত্যবোধের উপপত্তি হয় না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে শুধু উপপত্তির খাতিরেই অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি স্বীকার করা হইতেছে না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে ইহা মাত্র অপরিহার্যের গণ্ডীর মধ্যেই রহিয়া যাইত। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে প্রাকৃত রাজ্যেই অতিপ্রাকৃতবুদ্ধির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু প্রত্যক্ষানুভূতি থাকে। ঔচিত্য-বোধ ইহাকে প্রথম হইতেই প্রাকৃতবুদ্ধির অনুষ্ঠানরূপে প্রত্যক্ষ করি, যদিও সেই প্রত্যক্ষ অস্পষ্ট। অস্পষ্ট প্রত্যক্ষের অর্থ 'অংশবিশেষের' প্রত্যক্ষ নহে। প্রত্যক্ষের অসম্পূর্ণত্ব এখানে মোটেই পরিমাণগত নহে, ইহা প্রথম হইতেই বিজাতীয় অসম্পূর্ণত্ব। অংশবিশেষের প্রত্যক্ষ থাকিলে কতটা অংশ প্রত্যক্ষ করিতেছি বলা সম্ভব; কিন্তু প্রাকৃত রাজ্যে অতিপ্রাকৃতবুদ্ধির কতটা উপলব্ধি করিতেছি বলাই যায় না। কখনও বলিতে ইচ্ছা করে 'উহা প্রত্যক্ষই করিতেছি না', আবার পরমুহূর্তেই

বলিতে ইচ্ছা করে 'উহা প্রত্যক্ষ করিতেছি'। যেখানেই এই প্রকার 'হাঁ' ও 'না' উভয়ই বলা সম্ভব সেখানেই বিজাতীয় অসম্পূর্ণত্ব থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি অনেক পরিষ্কার হইবে। আকাশ (space) বলিলেই বিভুপরিমাণ (infinite) আকাশ বুঝায়—আকাশের অর্থই উহা। সুতরাং খণ্ডাকাশ প্রত্যক্ষ করিলেই বিভু আকাশ প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিতে হইবে; অথচ একভাবে বিভু আকাশ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিতেছি না। বিভু আকাশ প্রত্যক্ষের এই যে অসম্পূর্ণত্ব ইহাকেই আমরা বিজাতীয় অসম্পূর্ণত্ব বলিতেছি। কোন খণ্ডাকাশ প্রত্যক্ষ করিলেই ইহাকে বৃহত্তর আকাশের খণ্ড বলিয়া বুঝি; তদ্রূপ এই বৃহত্তর আকাশটিকে আরও বৃহত্তর আকাশের খণ্ড বলিয়া বুঝি; তৃতীয় আকাশটির বেলায়ও ঐ একই কথা, ইত্যাদি। সুতরাং যে কোনও আকাশখণ্ড প্রত্যক্ষ করিবার সময় সমগ্র আকাশই জ্ঞাত হয়। এই সমগ্র আকাশের জ্ঞান অনুমান নহে; কারণ ব্যাপ্তিসাপেক্ষ অনুমানে পূর্ণ নিশ্চয়তাবোধ কখনও থাকে না—সর্বদাই তাহার বিপরীত কল্পনা করা যায়—, অথচ যে কোনও খণ্ডাকাশের বাহিরেও আকাশ আছে, এই বোধের অপলাপ কল্পনাই করা যায় না। অতএব সমগ্র আকাশের জ্ঞান এখানে প্রত্যক্ষ। অথচ যে ভাবে খণ্ডাকাশ প্রত্যক্ষ করি সমগ্র আকাশ নিশ্চয় সে ভাবে প্রত্যক্ষ করি না—দুই কথাই এখানে বলিতে পারা যায়। ইহারই নাম বিজাতীয় অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ। অতিপ্রাকৃত-বুদ্ধির এই প্রকার বিজাতীয় অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রথম হইতেও থাকে বলিয়া ইহাকে এখনই অস্বীকার করা অসম্ভব।

ইহাকে এখনই অস্বীকার করা অসম্ভব—এই কথার অর্থ এমন নহে যে ইহাকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। কারণ আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে যাঁহারা একমাত্র বাস্তব জগৎকে 'সত্য হওয়া উচিত' বলেন তাঁহাদের কথা একান্ত মিথ্যা নহে। যদি এখনই তাঁহারা অতিপ্রাকৃতকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা ভুল করিবেন। কিন্তু আপাততঃ উহা স্বীকার করিয়া তাঁহারা বলিতে পারেন যে চরমে উহা মিথ্যা হইবে এবং তখন প্রাকৃত জগৎ একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এই প্রকার মতবাদ যে অযৌক্তিক নহে তাহার কারণ অতিপ্রাকৃত রাজ্যে কি ঘটিবে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃতবুদ্ধিতে কোনও নিশ্চিত বোধ নাই।

প্রাকৃতবুদ্ধিতে যাহা একান্ত পরোক্ষ থাকে তাহাকে প্রত্যক্ষ করাই যদি অতি-প্রাকৃতবুদ্ধির কাজ হয় তাহা হইলে তত্ত্ব বা আদর্শ প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাকৃত জগৎ পরোক্ষ হইয়া যায় তাহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা হইতে পারে।

এখন প্রাকৃত জগৎ যদি এই পুনঃপ্রচেষ্টার সত্যত্ব লাভ করিয়া অতিপ্রাকৃতের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই অতিপ্রাকৃত মিথ্যা হইবে।

ইহা যে অসম্ভব নহে তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। কোনও ব্যক্তির কার্যকর্ম দেখিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয় তাহা পরোক্ষ, ঐ ব্যক্তির কার্যকর্ম তখন প্রত্যক্ষ। পরে ঐ ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে সেই পরোক্ষ ধারণা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং তখন তাহার সেই পুরাতন বা ভবিষ্যৎ কার্যকর্ম আমার নিকট পরোক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ বন্ধুভাবে তাহার চরিত্র প্রত্যক্ষ করিবার পর আমি তাহার বাহ্য কার্যকর্মে আর কোনও বিশেষ মূল্য দিই না—সে মন্দ কায করিলেও প্রত্যক্ষীকৃত তাহার চরিত্রের সহিত ঐ কার্যের কোনও যোগসূত্র অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করি না, অথবা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেও তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন অসৎ ধারণা পোষণ করি না; তাহার ঐ কার্যকে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু বন্ধুত্বের মোহ হইতে কিংৎ পরিমাণে মুক্ত হইলেই পরোক্ষ প্রতিভাত ঐ কার্যটির আবার সমালোচনা আরম্ভ করি—অর্থাৎ ঐ কার্যটিকে প্রত্যক্ষের পর্যায়ে আনিবার চেষ্টা করি—এবং পূর্ণভাবে ঐ কার্যটির তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার পর হয়ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে পূর্বে বন্ধুটির চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা, এবং এই কার্যটি অতি গুরুতর। অর্থাৎ ইহা তাহার সেই পূর্ব চরিত্র অপেক্ষা গুরুতর—অতএব ইহাই সত্য।

বন্ধুত্ব এক প্রকার অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি। ইহার দ্বারা প্রাকৃত প্রত্যক্ষের অযোগ্য অনেক কিছু পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যাহা ঘটে তাহা অন্যপ্রকার অতিপ্রাকৃতবুদ্ধির ক্ষেত্রেও ঘটিতে পারে। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। অনেক সময় অনেক মহাপুরুষের এইরূপ আদর্শচ্যুতি ঘটে। মহাপুরুষগণ সকলেই তত্ত্বপ্রত্যক্ষের পর লৌকিক পদার্থের সহিত ঐ তত্ত্বের সম্বন্ধ নিরূপণে সচেষ্ট হন—তত্ত্বের তুলনায় প্রাকৃত পদার্থ পরোক্ষ এইটুকু উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, পরোক্ষীভূত লৌকিক পদার্থকে পুনরায় অতিপ্রাকৃততর-বুদ্ধির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করেন। ফলে অনেক সময় পূর্বের আদর্শ মিথ্যা হইয়া যায়, এবং বাস্তব জগৎকেই তাঁহারা চরম সত্য বলিয়া মনে করেন।

এই প্রকার আদর্শচ্যুতি যে ঘটিবেই এমন নিয়ম নাই। লৌকিক জগৎকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া অনেকে দেখিতে পারেন যে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা; অনেকে দেখেন যে উহা আদর্শেরই বিশেষণবিশেষ; অনেকে আবার দেখেন যে উহা

আদর্শের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত সত্য; কেহ বা দেখেন যে দুই-এরই অতীত এক চরমতর সত্য আছে, ইত্যাদি।

সুতরাং অতিপ্রাকৃত রাজ্যে কি যে ঘটিবে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে এই বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত আদর্শকে অপরিহার্য বলিয়া মানিতে হইবে। আরও মানিতে হইবে যে এই আদর্শের সত্যত্ব প্রাকৃত মানববুদ্ধির অগোচর অতিপ্রাকৃতবুদ্ধিতেই ইহার সত্যত্ব উপলব্ধ বা সৃষ্ট হয়। দর্শন শাস্ত্র এই অতিপ্রাকৃতের সন্ধান দেয় মাত্র, কারণ এই শাস্ত্র প্রাকৃত মানববুদ্ধিরই অধীক্ষা। দর্শনই বলিতেছে যে দর্শনভূমি ত্যাগ করিয়া একবার অতিদর্শনের রাজ্যে যাইতেই হইবে। তবে তাহার পর পুনরায় দর্শনভূমিতে প্রত্যাবর্তন হইতে পারে।

তত্ত্বের স্বরূপনির্ধারণে মতভেদ

অতিপ্রাকৃতবুদ্ধি কাহারও মতে জ্ঞানাত্মক, কাহারও মতে বা কর্মাত্মক। আবার একদল দার্শনিক আছেন যাঁহাদের মতে ইহা রসবোধ মাত্র। জ্ঞান, কর্ম ও রস—এই তিন ক্ষেত্রেই আমাদের ঔচিত্যবোধ থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—এই তিন ক্ষেত্রের আদর্শ কি বিভিন্ন প্রকার, অথবা চরমে উহা একই তত্ত্ব, ইহাদের মধ্যে একটিই প্রকৃত তত্ত্ব এবং অন্যগুলি তত্ত্বাভাস মাত্র?

অন্য একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে—আদর্শ বুদ্ধিনিরপেক্ষ কোনও পদার্থ কি না? কর্মপন্থীরা ইহাকে বুদ্ধিসৃষ্ট সত্য বলিতে চাহেন, জ্ঞানপন্থীরা বলেন ইহা বুদ্ধিনিরপেক্ষ পরিনিষ্ঠিত সত্য। রসপন্থীরা কি বলিতে চাহেন তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ বলেন রস নিরপেক্ষ বস্তুতন্ত্র পদার্থ—রসবোধে ইহা প্রকাশিত হয় মাত্র। কেহ বলেন রস রসবোধের সৃষ্টি মাত্র। কেহ বা দুই কথাই বলেন—তাঁহাদের মতে রস ও রসবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত, একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিয়া ধরা যায় না।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্র জুড়িয়া এই সব প্রশ্নের আলোচনা আছে। তাহার মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না। আমরা এখানে কেবল ইহাই দেখাইতে চাই যে কোনও মতকে ভুল বলিতে পারা যায় না, অথচ সর্বমতের সাধারণ একটি মত স্থাপন করাও দর্শনের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, দর্শন এই সমস্ত মতের আলোচনা করিতে গিয়া নিজের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। দর্শন প্রাকৃতবুদ্ধির ব্যাপার। অন্যায়ভাবে সে অতিপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশ করে বলিয়াই দিশাহারা হইয়া কখনও এ মত কখনও ও মত গ্রহণ করে। অতিপ্রাকৃতের আইনকানুন জানে না বলিয়াই আজ পর্যন্ত সে কোনও নিশ্চিষ্ট সমাধান দিতে পারে নাই।

প্রথমেই দেখা যাউক আদর্শবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সাধারণ কোনও মত পাওয়া যায় কি না? বিভিন্ন মতবাদ যদি একই চরমসত্যের পরিমাণগত অসম্পূর্ণজ্ঞান হইত তাহা হইলে যোগবিয়োগ প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ চরম সত্যটিকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইত। কিন্তু প্রাকৃতজ্ঞানের স্বরূপই তাহা নহে। ইহা অতিপ্রাকৃতের বিজাতীয় অসম্পূর্ণজ্ঞান। বিজাতীয় অসম্পূর্ণত্ব স্থলে যোগবিয়োগ সম্ভবই নহে। কারণ সেখানে 'সমস্ত' সত্যটাই অস্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইতেছে। উপায় থাকিত যদি দুই অস্পষ্ট জ্ঞানের মধ্যে একটিকে স্পষ্টতর বলা যাইত। কিন্তু তাহাও সম্ভব নহে। বিজাতীয় অসম্পূর্ণত্ব স্থলে এই প্রকার তুলনামূলক সমালোচনা একান্ত অসম্ভব। আদর্শহিসাবে প্রকৃত স্পষ্ট জ্ঞানের দূরস্থ ধারণা থাকিলেও, একেবারে বিজাতীয় বলিয়া কোন্ অস্পষ্টজ্ঞান স্পষ্টজ্ঞানের নিকটবর্তী—এই প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের আকৃতির নিকটবর্তী আকৃতি তাঁহার জ্ঞাতীয়, অর্থাৎ মনুষ্য-জাতীয়, ব্যক্তিগণের মধ্যেই খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব, পিপীলিকার মধ্যে রবীন্দ্রসদৃশ আকৃতির অন্বেষণ নিরর্থক। সুতরাং অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে প্রাকৃতরাজ্যে যে নানা মতবাদ আছে তাহাদের সাধারণ মতবাদ খুঁজিয়া বাহির করা দর্শনের পক্ষে সম্ভব নহে।

এখন দেখা যাউক, এই নানা মতের মধ্যে কোনওটিকে ভুল বলা যায় কি না? অনেকে বলিতে পারেন যে নানা বলিয়াই এই একাধিক মতের সবগুলিই যথার্থ হইতে পারে না। যথার্থ হইত যদি প্রতি মতবাদ অতিপ্রাকৃত সত্যের অংশবিশেষের প্রকাশ হইত। কিন্তু প্রাকৃত জ্ঞান সম্পূর্ণ বিজাতীয় বলিয়া অংশবিশেষের প্রকাশের কথাই উঠিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত মতগুলিকেই যথার্থ বলা যায় না।

এই কথা কিন্তু সঙ্গত নহে। বিভিন্ন অংশের প্রকাশ হইলেই একাধিক মতের সবগুলি যথার্থ হইবে, অন্যথা নহে—এমন নিয়ম নাই। দেখান যাইতে পারে প্রতি অনুভববিরোধস্থলে বিরুদ্ধ অনুভবগুলির সব কয়টিকেই যথার্থ বলা উচিত।

দার্শনিক তর্কবিতর্ক প্রায়ই এক একটি বিশিষ্ট অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়। এক জন বলেন আমার এই প্রকার অনুভূতি হইতেছে, অপর এক জন বলেন আমার এতদ্বিরুদ্ধ এই প্রকার অনুভূতি হইতেছে। অনুভববিরোধের কথা আসিয়া পড়িলে তার তর্ক চলে না। তুমি একটি রংকে নীল অনুভব করিয়া কয়েকটি কথা বলিলে, আমি ঐ রংটিকেই লাল অনুভব করিয়া তোমার বিরুদ্ধ কয়েকটি কথা বলিলাম। যতক্ষণ এই মূলগত অনুভববিরোধের কথা ধরা না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তর্ক পুরাদমে চলে। কিন্তু যেই আমরা বুঝিতে পারি যে মূলে এই অনুভববিরোধ

রহিয়াছে অমনই তর্কে ক্ষান্ত হই। সমস্ত দার্শনিক তর্কবিতর্কের মূলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রকার অনুভববিরোধ রহিয়াছে—দর্শনের ইতিহাসে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। এখন এই অনুভববিরোধস্থলে আমি কি বলিতে পারি যে তোমার অনুভবটি ভুল? আমার অনুভব যে যথার্থ ইহা আমি মানিবই; কিন্তু তোমার অনুভব সম্বন্ধে আমার কি মন্তব্য করা উচিত? ইহাই কি উচিত নহে যে আমার অনুভবকে আমি যথার্থ বলিয়া মানিব, কিন্তু তোমার অনুভব সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না—উহা আমার নিকট যথার্থও নহে, অযথার্থও নহে। তদ্রূপ তোমার অনুভবকে তুমি সত্য বলিয়া মানিবে, কিন্তু আমার অনুভব সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবে না—উহা তোমার নিকট যথার্থও নহে, অযথার্থও নহে। অতএব এক দিক্ দিয়া দুই অনুভবই যথার্থ।

আপত্তি হইতে পারে—অনুভবদ্বয় পরস্পরবিরুদ্ধ, দুইটিই যথার্থ হইবে কি করিয়া? উত্তর এই যে, দুই বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে একটিকে কেবল বিরুদ্ধ বলিয়াই মিথ্যা বলা যায় না, যদি না তাহারা একই দেশে একই সময়ে থাকিবার চেষ্টা করে। তদ্রূপ দুই বিরুদ্ধ অনুভব একই সময়ে একই অনুভবিতার অনুভব না হইলে মিথ্যা বলা যায় না। এখানে তাহাই হইতেছে—তোমার অনুভব তোমার নিকট যথার্থ, আমার অনুভব আমার নিকট যথার্থ।

ইহা আপেক্ষিকতাবাদ নহে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে কোন পক্ষকেই 'একেবারে যথার্থ' বলিয়া স্বীকার করা হয় না, কিন্তু অনুভববিরোধস্থলে আমার অনুভবকে 'একেবারে যথার্থ'ই বলি। আমার অনুভবকে যখন যথার্থ বলি তখন তাহা যে কেবল আমার নিকটই যথার্থ এমন কথা আমার মনেই থাকে না; বরং আমি বলিতে চাহি যে সকল সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরই এই প্রকার অনুভব হয়। অর্থাৎ এই অনুভব আপেক্ষিক নহে। তদ্রূপ তুমিও তোমার অনুভবকে একেবারে যথার্থ বলিতে পার।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে—তোমাকে যখন আমার অনুভব স্বীকার করিতে বলিতেছি, তাহা না হইলে তোমাকে যখন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি না, তখন প্রকারান্তরে তোমার অনুভব তো অস্বীকার করিলাম; তবে কেমন করিয়া বলিতে পারি যে তোমার অনুভবও 'একেবারে যথার্থ'? উত্তর এই যে তোমার অনুভব সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলাম না; কেবল এইটুকু বলিয়াছি যে আমার অনুভব যথার্থ এবং ইহা সকলের জানা উচিত। তোমার অনুভব অসুস্থব্যক্তির অনুভব এমন কথার সূচনা তো দিই নাই। আমার অনুভব মান নাই বলিয়া ততদূর পর্যন্ত তুমি অসুস্থমস্তিষ্ক। কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে তুমি

যাহা কিছু বলিতেছ বা বলিবে সমস্তই অসুস্থমস্তিষ্কপ্রসূত। এক বিষয়ে তোমার অস্বীকার করার অর্থ ইহা নহে যে সর্ব বিষয়ে তোমার সদ্‌গুণ অস্বীকার করি। তোমার কথা হয়ত তুমি সম্পূর্ণ সুস্থভাবেই বলিতেছ—কেবল আমি তোমার ঐ অনুভব গ্রহণ করিতে বাধ্য নহি।

আবার আপত্তি হইতে পারে—তোমার অনুভবকে যদি সুস্থমস্তিষ্কের অনুভব বলিয়া অস্বীকার না করি তাহা হইলে আমার উহা গ্রহণ করা উচিত, কারণ ঐ একই কারণে সকলকে আমার অনুভব গ্রহণ করিতে বলিয়াছি। কিন্তু উত্তর এই যে আমার অনুভব সকলকে যে গ্রহণ করিতে বলি ইহাও আমি অনুভব করি, কিন্তু এখন অনুভব আমার হয় না যে অপর সুস্থ ব্যক্তির অনুভব আমি গ্রহণ করিতে বাধ্য। অপরের মত গ্রহণ করিতে আমি বাধ্য নহি কিন্তু আমার মত অপরে গ্রহণ করিবে, ইহাই হইল জ্ঞানরাজ্যে মানুষের সহজ সংস্কার। অপরের মত আমার নিকট বড় জোর অপরিহার্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অপরিহার্য ও সত্যের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অবশ্য অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করার অর্থই হইল 'সত্য হওয়া উচিত' বলা। কিন্তু যেখানে পরোক্ষ অপরিহার্য তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই সেখানে উহা আমার নিকট সত্যত্বের দাবী করিতে পারে না। সত্যত্বের দাবী থাকিলেই যে সেই দাবী আমার নিকট উপস্থাপিত হইবে এমন নিয়ম নাই।

অতএব আমার অনুভব আমার নিকট যথার্থ ও তোমার অনুভব তোমার নিকট যথার্থ—এই মতবাদ আপেক্ষিকতাবাদ নহে। ইহাকে আপেক্ষিকতাবাদ না বলিয়া পাক্ষিকতাবাদ বলা উচিত। অভিপ্রায় এই যে, একই প্রশ্নের একাধিক পাক্ষিক যথার্থ উত্তর থাকিতে পারে। পাক্ষিক উত্তর আংশিক উত্তর নহে। আংশিক উত্তরের ক্ষেত্রে 'ইহা এবং উহা' বলিতে হয়, কিন্তু একাধিক পাক্ষিক উত্তরকে 'ইহা অথবা উহা' বলা উচিত।

এই প্রকার অথবাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিলে বিরোধ সত্ত্বেও একাধিক বিরুদ্ধ অনুভব যথার্থ হইতে পারে। আপেক্ষিকতাবাদে বিরোধ নিবন্ধন কোন পক্ষকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না; কিন্তু পাক্ষিকতাবাদে বিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক পক্ষকেই সত্য বলা হইতেছে। দুই বিরুদ্ধ পদার্থ একই সময়ে একই স্থলে এক সঙ্গে সত্য কি করিয়া হইবে?—এই আপত্তি উঠিলে আমরা বলিতে পারি যে এক দিক্ দিয়া দুইটিকে এক সঙ্গে সত্য বলিতেছি না, কারণ অথবাত্মক বাক্যে পক্ষদ্বয়ের যে কোন 'একটি' অভিপ্রেত হয়। আবার, যে কোনও 'একটি' অভিপ্রেত হইলে দুইটি পক্ষই সত্য কি করিয়া হইল?—এই আপত্তি উঠিলে আমরা বলিব

যে দুইটিরই সত্য হইবার সমান অধিকার, কোনটিকেই ত ত্যাগ করিতেছি না। বেশ, আপাততঃ কোনটিকে ত্যাগ করিব?—এই আপত্তি যদি উঠে তাহা হইলে আমরা বলিব যে অপরটিকে ত্যাগ করা বা ভুল বলিবার অধিকার আমাদের নাই; অথবাত্মক বাক্যের তাৎপর্যই হইতেছে এই যে একটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অপরটির বিষয়ে আমাকে নীরব থাকিতে হইবে, কারণ অপরটি যদি একান্ত মিথ্যাই হইত তবে তাহাকে একবার সত্য বলিতে গিয়াছিলাম কেন, অথচ সে যে সত্য হয় নাই ইহাও ঠিক, কেন না আমি অন্যটিকেই সত্য বলিয়া পাইয়াছি।

অথবাত্মক বাক্যের অধিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। মোট কথা এই, প্রাকৃতবুদ্ধিতে অতিপ্রাকৃত যে নানা আকারে অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাহার প্রতিটিই যথার্থ। তবে তাহারা পাক্ষিকভাবে যথার্থ—'ইহা এবং উহা' এই প্রকার বাক্যে তাহাদের যথার্থ প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ 'প্রস্থানভেদে সত্য ভেদ' বলিয়া যে কথাটি বলা হয় আমরা ঠিক্ সে কথা বলিতেছি না। কারণ লোকে 'প্রস্থান ভেদে সত্য ভেদ' বলিতে এমন বুঝে না যে প্রস্থানগুলিও পাক্ষিকভাবে 'একেবারে যথার্থ'। আমরা কিন্তু তাহাই বলিতে চাহি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারে ব্রহ্মাস্বাদের আনন্দ, নাগরিকতার বৈদগ্ধ্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর রোমান্টিক ভাববিলাসের ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। এই ত্রিধারার প্রবাহ তাঁহার কবিমনকে নিরন্তর সঞ্জীবিত করিয়াছে। যুগোচিত জীবধর্মের আশ্রয়স্থল নানা সমস্যার বিতর্ক তাঁহার আত্মসমাহিত সৌন্দর্য্যের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে নাই; বর্ত্তমানের প্রয়োজন তাঁহার প্রয়োজনাতীত সৌন্দর্য্যরতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মচর্য্যের শুচি-কঠোর সৌন্দর্য্যের রসে আবাল্য তাঁহার মন আপ্লুত; তাই উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধের পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্য-বিলাসীদের প্রবর্ত্তিত মঙ্গলের স্পর্শলেশহীন নিরতিশয় শুষ্ক সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার ভাবুক মন, যে মন কৌতুকময়ীর নিত্য নবীন কৌতুকের মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরের গহনবাসীর প্রতিটি বিস্ময়ে সাড়া দিয়াছে—সেই ভাবুক মন নিরন্তর নিখিলের সমস্ত আনন্দ আকণ্ঠ পান করিয়াও অবসন্ন হয় নাই; প্রতিদিন তৃপ্তিহীন যে লিপি বারে বারে পড়িয়াও ধরণীর ক্লান্তি নাই, তাঁহার কবিচিত্ত মুগ্ধ-বিস্ময়ে ধরণীর সেই লিপির অনুবৃত্তি করিয়াই চরিতার্থ বোধ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যাস্বাদ দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ পরিধি অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের রসতত্ত্বে তাঁহার কাব্য-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইলেও যাহা প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যে স্বপ্রকাশ তাহাকে সহজে গ্রহণ করিতে তাঁহার বেদান্ত-পরিপুষ্ট ও নাগরিকতা-প্রবণ মনের কোনও সঙ্কোচ বা অভিমান হয় নাই। কাদম্বরীর সুবিন্যস্ত ও সুপ্রসারিত বর্ণবাহুল্যে তাঁহার মন পীড়িত হয় নাই, কারণ তিনি কলাকুশল বিদগ্ধ নাগরিক। আবার লোক-সাহিত্যের অন্তরালে যে মানব মন প্রচ্ছন্ন, বা যে সাধকের সঙ্গীত নিতান্ত নিরাভরণ তাহার অনির্ব্বচনীয়তাও তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

সাহিত্যের বিচারে একটি কথা বারম্বার বলিয়াও তিনি ক্লান্তিবোধ করেন নাই—"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য।" আমাদের চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ; জৈব প্রয়োজনের কঠোর নিষ্পেষণে বহির্জগতের এই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট হইয়া যায়। কবির হৃদয়ের সহজ আনন্দের সহিত এই আনন্দের স্রোত সম্মিলিত হয়। তখন হয়

প্রকাশ। অন্তরবাসী তখন হৃদয়াবেগের অকস্মাৎ মুক্তিতে বিহ্বল হইয়া বহির্জগৎকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কেন এমন হয়? অন্তরাত্মার লীলাতেই আনন্দ। "একোঽহং বহু কুর্য্যাং"—এক বহুধা বিভক্ত হইলেন। আমাদের অন্তরে সেই এককে নিবিড়ভাবে আস্বাদন করিবার সহজ ব্যাকুলতা। তাই চেতনারাজ্যের বহুকে ভাবরাজ্যের নৈর্ব্যক্তিক একের সহিত একীকরণে আমাদের আনন্দ। কবি যে বহুকে আনন্দরূপ এবং অমৃত বলিয়া উপলব্ধি করেন সে তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনবশে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন, "ন বারে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।" নিখিলের সৌন্দর্য্যস্রোতে অবগাহনেও কবির চিত্তের পক্ষে অন্যরূপ প্রয়োজন। এই অবগাহনেই মুক্তি, এই অবগাহনেই একের স্বাদ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ব্রহ্মের লীলাকৈবল্যে যে আনন্দ সৃষ্টিতেও সেই একই আনন্দ। ঐক্যবোধের আকুতি বহুকে সুনিয়ন্ত্রিত একে পরিণত করিতেছে, এবং সেই এক আবার কবিচিত্তের রসায়নে রসায়িত হইয়া বিশিষ্ট বহুতে পরিণত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডীতত্ত্ব এই একের আস্বাদনে প্রতিষ্ঠিত। দুঃখ আমাদের আনন্দ দেয় কেন? "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক।" অবসাদেই দুঃখ। "আমি আছি" এই চেতনাবোধ যখন অবসাদগ্রস্ত বা জড়তাচ্ছন্ন তখনই দুঃখ। ট্র্যাজেডী আমাদের আনন্দ দেয়, কারণ দুঃখের গভীর উপলব্ধিতে আমাদের ঐক্যোন্মুখ চিত্ত সহজেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। যে ঐক্যবোধ মনের রুদ্ধদ্বার হইতে বারম্বার ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে গভীর দুঃখে সেই সুপ্ত ঐক্যবোধের পুনর্জাগরণ। গ্রীক 'ক্যাথারসিস্' তত্ত্ব অপেক্ষা ট্র্যাজেডীর এই ব্যাখ্যা অনেক নিপুণতর। গ্রীকতত্ত্বে ট্র্যাজেডী বহুলাংশে প্রয়োজনের দাস—লৌকিক প্রয়োজন বা জীবধর্ম্ম এই তত্ত্বের অনেকখানি জুড়িয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে লৌকিক প্রয়োজনের ছায়ামাত্রও নাই।

নিখিলের সৌন্দর্য্যস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেই কি কবির কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হইবে? না। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে শুচিতাবোধ চাই। "যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে"। আনন্দের দিক হইতেই উপভোগে সংযমের প্রয়োজন। যাহা নিতান্তই সুগোচর তাহা ইন্দ্রিয়ের দাবী মিটাইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত যে আনন্দবোধ অসংযম তাহাকে পীড়িত করে। অশুচিমনে উত্তপ্ত অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন তাই সতী রাজমহিষীকে তিনি দেখিতে পান নাই। গোতিয়ের মাদ্‌মোয়াজেল্ দ্য মোপ্যার সৌন্দর্য্যে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হন নাই, কারণ জীবনের প্রগাঢ় সত্যের বহির্দ্বারে এই অতিললিত সৌন্দর্য্যে

আমরা জগতের চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না। মঙ্গলের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধকে উদ্দীপিত করিয়াছে বলিয়াই পেটারের বা অস্কার ওয়াইল্‌ডের ন্যায় সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বতার রিক্ততায় তাঁহার মন সাড়া দেয় নাই। আনন্দেই মঙ্গলের পরিণতি—সুতরাং যে মঙ্গল পাশ্চাত্য কাব্যজিজ্ঞাসায় বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সেই মঙ্গল সৌন্দর্য্যের পথে অন্যরূপ স্বরূপ হওয়া দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যেই লীন হইয়াছে। যে সৌন্দর্য্যে পরিণতি নাই সেই অগভীর চাকল্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। শেষ মূল্যবিচারে পূর্ণতাকেই তিনি শ্রদ্ধা করেন, তাই বিদ্যাপতির রাধিকায় তিনি "নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য" দেখিয়াছেন, চণ্ডীদাসেই পাইয়াছেন "গভীরতার অটল স্থৈর্য্য।" মঙ্গল সুন্দর, কারণ তাহা প্রয়োজনেই নিঃশেষ নয়, জীবধর্ম্মের জন্য মঙ্গলের প্রয়োজন নাই, সেই প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া ধ্রুব আনন্দলোকের পরিচয় দেয় বলিয়াই মঙ্গল সুন্দর। মঙ্গলের বন্ধনহীন সৌন্দর্য্যে লালিত্য থাক, যাদুকরী থাক, গভীরতা নাই। রামায়ণ মহাভারতের যে আদর্শকে ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে তাহাও এই মঙ্গলের মহিমায় মহীয়ান।

সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্য সুপ্রত্যক্ষ। যাহা কিছু রসহীন তাহার প্রতি তাঁহার সুগভীর বিরাগ। সাহিত্যে শুধু সেইটুকুই সত্য যাহার প্রমাণ রসের ভূমিকায়। "সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কারণ-পরম্পরা সে কথা জানাইবার জন্য অন্য শাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।" সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে আর্টের বেদীতে চড়াইতে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুত নন। "বাস্তবতা মানে এ নয় যা সদাসর্ব্বদা হয়ে থাকে;" কারণ যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাই আনন্দ এবং আনন্দই আর্টের প্রাণ। যাহা কিছু স্থূল তাহাই পরিহার্য্য। যে সমালোচক শিল্পীর ন্যায় সৌন্দর্য্যে বিভোর নয়, তাহাকে তিনি বলেন নিন্দুক। ক্রিটিকের আভিধানিক সংজ্ঞা যাহাই হউক "নিজের অথবা সর্ব্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময় ব্যক্ত" করাই কি সমালোচকের একমাত্র কর্ত্তব্য? সত্য বটে, সমালোচক শিল্পীর ন্যায় বহির্জগতের সহিত অন্তর্লোকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু সৃষ্টি করেন না বলিয়াই সমালোচকের ব্যবসা অবজ্ঞেয়? মহাকাব্যের সমালোচক ভক্তি-বিগলিত বিস্ময় ব্যক্ত করেন বটে; তাহার কারণ আর্টের আত্ম-সমাবিষ্ট সৌন্দর্য্য-সম্মোহনের বহু উর্দ্ধে মহাকাব্যের স্থান। তাই তাহার বিচারে মনন বা আস্বাদন অপেক্ষা বিস্ময় বা ভক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কিন্তু স্রষ্টা নন বলিয়াই সমালোচককে শুধু পূজারী বা পুরোহিত হইতে হইবে? রবীন্দ্রনাথ

পূজারীর মত রামায়ণ মহাভারতের বিশালতায় ভক্তিবিগলিত বিস্ময় ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু শুষ্ক হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচারে যাহাদের পরিচয় পাওয়া যায় না, আকুল হইয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সহিত যাহাদের আপন করিয়া লইতে হয়, সেই উৎসাহবহুল সর্ব্বস্বগতপ্রাণ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী সৌন্দর্য্যবিলাস ও বিদগ্ধ নাগরিকতার পরিপন্থী। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে তাঁহার নিপুণতাই বেশী প্রত্যক্ষ। ভাববেগ যেখানে বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবিমন সেখানেই উল্লসিত হইয়া তাহাকে স্বীকার করিয়াছে। এই সহজ পরিচয়ের ঐশ্বর্য্যে তাঁহার কাব্য, আলোচনা, পত্রাবলী ঐশ্বর্য্যবান। কিন্তু কোনও কবি বা শিল্পীকে ঠিক করিয়া বুঝিতে হইলে তাঁহার শিল্পকলাকে তাঁহার পরিবেইনী হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে অনেক সময়ই পরিচয় অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য অনেক স্থল কথার অবতারণা করিতে হয়। প্রকাশের স্বতন্ত্র আনন্দকে তথ্যের ও বস্তুর খাদে না মিশাইলে সমালোচকের চলে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই খাদ নাই, কারণ তথ্যের প্রতি—যে তথ্যকে তিনি অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ বলিয়া থাকেন—তাঁহার আর্টিষ্ট-সুলভ অবজ্ঞা—বস্তুর প্রতি তাঁহার মরমী মনের সংশয়।

তথ্যকে রবীন্দ্রনাথ অবিশ্বাস করেন। যাহা ঘটিতেছে তাহা ঘটিতেছে বলিয়াই প্রত্যক্ষ, পাশ্চাত্য রিয়ালিজ্‌ম্‌-এর এই জবরদস্তীতে রবীন্দ্রনাথের মন সায় দেয় নাই। কারণ শিল্পের বাস্তবতা শুধু তাহার অনির্ব্বচনীয়তায়ই সার্থক। তথ্যকে তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে পাংক্তেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে শুধু তথ্যের নিজস্ব গৌরব কিছু নাই; কিন্তু স্থূল প্রয়োজনের প্রতি তাঁহার অতি-বিদগ্ধ অশ্রদ্ধা তাঁহাকে অতিমাত্রায় বাস্তবতা বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার বিলাসী মন তাই ভোজ্যবস্তুর নামমাত্রে সঙ্কুচিত বোধ করে। "খবরের কাগজী কিম্ভূত ভাষার" প্রতি তাঁহার বিরাগ, এবং সজনেফুল জামরুলফুলের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা একই বিলাসী মনের পরিচায়ক।

কিন্তু সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার রোমান্টিক মনই তাঁহার সাহিত্য বিচারকে বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে তাঁহার অটল বিশ্বাস। অবশ্য মালার্মের "পিওর পোয়েট্রি"তে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান নহেন, "রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে"। "মানুষের সৃষ্টি-চেষ্টা অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট বিশেষকে জানবার চেষ্টা"। তাই রচনা রচয়িতার জন্য না হইলেও যে আনন্দ রসরচনার প্রাণ সে আনন্দ কবির একান্ত নিজস্ব সামগ্রী একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলিয়াও তৃপ্ত হন নাই। একদিকে যেমন নির্ব্বিশেষকে বিশেষরূপে মণ্ডিত করাই কবির সাধনা; অন্যদিকে আবার নির্ব্বিশেষ মানবেরই বরণীয় সৌন্দর্য্যের

বিশেষরূপে সেই অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষের নিরিড় উপলব্ধি চাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সাহিত্যকে দেশকাল পাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না।" একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে কোনও কোনও সাহিত্য দেশকালের দাবী মিটাইয়াই নিঃশেষ হইয়া যায়, নিখিলের সভায় তাহার দেয় কিছুই থাকে না। বেন্ জন্‌সন্ ও ডেকারের নাটো লণ্ডন-জীবনের যে স্পন্দন তাহা আর সক্রিয় নাই। বহু শব্দ, বহু সামাজিক রীতি, বহু তথ্য আজ তথ্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহা দেশকালের অতীত সেই মৃত্যুঞ্জয় চিরন্তন এই নাট্যকবিতাকে স্পর্শ করে নাই, তাই পণ্ডিতের কাছে বরণীয় হইলেও রসিকের কাছে বেন্ জন্‌সনের মূল্য বেশী নহে। কিন্তু বেন্ জন্‌সন্—নাট্যকার বেন্ জন্‌সনের কথা বলিতেছি, হেরিকের কবিগুরু ডগ্, সান্, ও টুপ্‌লটন-বিহারী বিরাটকায় অতি সজীব নাগরিকটির কথা নহে—আজ বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন বলিয়া বা আরও অগণিত প্রতিভাবান লেখকের যশোভাতি পাণ্ডুর হইয়াছে বলিয়াই কি স্বীকার করিতে হইবে দেশকাল পাত্রের উল্লেখমাত্রে সাহিত্যের মূল্য খর্ব্ব হইয়া যাইবে? ইহার কারণ কি এই নয় যে বেন্ জন্‌সনের প্রতিভাই পরিমিত ছিল এবং মননের গতিবেগের অনুরূপ কল্পনার গভীরতা তাঁহার ছিল না?

কথাটাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে গদ্যে মেঘদূতের কত সুনিপুণ বিশ্লেষণই না করিয়াছেন। এই মেঘদূতকে তিনি শুধু অখণ্ড সৌন্দর্য্যরূপে উপভোগ করিতে চান করুন। মেঘদূত যে চিরবিরহীর বাণী বহন করিতেছে—বিদ্যাপতির "এ ভরা বাদর মাহ ভাদরের" মত নিখিলের চিত্ত যে এই ব্যথা চিরদিনই আলোড়িত করিবে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বিরহীর ব্যথা একই সঙ্গে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, একান্ত তাহারই এবং বিশ্বমানবেরও বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "এখন যাকে পাব্লিক বলছি কালিদাসের সময়ে সেই পাব্লিক অত্যন্ত গা ঘেঁসা হয়ে শুধু শ্রোতারূপেই ছিল না। যদি থাকত তাহলে যে মানবসাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তারা অনেকটা পরিমাণে আটকে দিত", তখন পাব্লিকের প্রতি অবজ্ঞা ছাড়াও আর একটা সত্য প্রকাশ হয়। যাহা চিরন্তন তাহা কালকে অতিক্রম করিবেই। কিন্তু কালকে অতিক্রম করা অর্থে কি রবীন্দ্রনাথ দেশকাল পাত্রের পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করা বোঝেন? নবরত্নের—ঐতিহ্যের নবরত্ন, ইতিহাসের নবরত্ন না হোক—সব রত্নই যদি তলাইয়া গিয়া থাকেন তাহার কারণ কি তাঁহারা কালের প্রয়োজন মিটাইয়াছিলেন বলিয়াই, না তাঁহাদের ক্ষমতাই সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া? কালিদাসের মেঘদূতে মানবের প্রয়োজনের ছাপ আছে ইহাও যেমন সত্য, কালিদাসের মেঘদূতে গুপ্তসাম্রাজ্যের

পরিমণ্ডলের সুস্পষ্ট ছাপ আছে একথাও কম সত্য নহে। সেক্‌স্‌পীয়র কালকে অতিক্রম করিয়াছেন ইহাও সত্য; কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রের রসসৃষ্টিতে, পূজারীর ন্যায় বিহ্বল বিস্ময়প্রকাশে কত বিঘ্ন, তাহার পরিচয় ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর দেশ-কালপাত্র-বিরহিত সেক্‌স্‌পীয়র-পূজায় আমরা পাইয়াছি। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া দেশকালের পরিমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা সেক্‌স্‌পীয়রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট তাঁহারা সেক্‌স্‌পীয়রকে খাটো করিয়াছেন—একথা স্বীকার করা যায় কি?

দেশকালপাত্রকে সাহিত্যবিচারের বহির্ভূত করার রবীন্দ্রনাথের এই যে চেষ্টা, ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথের অন্তরে একটা বিরোধ। আবাল্যের সংস্কার প্রসূত সংযমের প্রতি তাঁহার একটি অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখিতে পাই। এই সংযম তাঁহাকে সাহিত্যে মঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়াছে। মঙ্গলকে স্বীকার করিলেই প্রয়োজনকে কিছু স্বীকার করিতেই হয়। রামায়ণের পাতিব্রত্য ও প্রভুভক্তির প্রতি তিনি সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যেও প্রেমের এই সংযম ও কল্যাণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। "এই সৌন্দর্য্য শ্রী, হ্রী, এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান। তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয় স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ, এবং ধর্ম্মের দ্বারা ধ্রুব।" আবার অন্যদিকে তাঁহার কবিচিত্ত রামচন্দ্রের লোকরঞ্জনে পীড়িত। কারণ লোকরঞ্জন লৌকিক প্রয়োজন। ভবভূতির রাম বাল্মিকীর রামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে রাম বিরহ-কাতর। বিরহকাতরতায় সে রাম সর্ব্বমানবের সগোত্র। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের বিশালতায় অভিভূত, তিনিই বলিয়াছেন—"বাল্মিকীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে রামকে তিনি ভালো বলেন, লক্ষ্মণকে ভালোবাসেন।" লক্ষ্মণের প্রতি এই যে মমত্ববোধ ইহার উৎপত্তি তাঁহার কবিমনে; যে কবিমন অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, উর্ম্মিলা, পত্রলেখার উপেক্ষায় ব্যথিত। যে মন তাঁহাকে বলাইয়াছে "রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে" সে মন প্রয়োজনকে স্বীকার করে। সে মন বঙ্কিমকে স্বীকার করিয়াছে। সে মন দেশকালের পরিমণ্ডলীকে অস্বীকার করে নাই। আর যে মন নিত্য নবনব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইতেছে, সে তাঁহার রসপিপাসু কবি মন। এই কবিমানসই তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের পূজারী করিয়া তুলিয়াছে এবং বহির্জগতের প্রয়োজনকে নিজের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনবশে আপনার করিয়া লইয়াছে। কোলরীজ বলিয়াছেন—

"We receive but what we give
And in our life alone does nature live."

কোলরীজের মতই রবীন্দ্রনাথ বহিঃপ্রকৃতির সহিত কবিমানসের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে

বলিয়াছেন, "প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।" এই হৃদয়ের ব্যাপ্তি যেখানেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার রসিক মন সেখানেই সাড়া দিয়াছে। যাহা কিছু হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে সুন্দর, তাহারই আস্বাদনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারকে মণ্ডিত করিয়াছে।

হাতী-শিকারে অভিজ্ঞতা

মহারাজা শ্রীভুপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা

(সুসঙ্গ)

বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার যাঁহারা সুযোগ পান, নিতান্ত নিরুৎসুক দৃষ্টি লইয়া চলিলেও বন্য-জীবনে অতি বিস্ময়কর ঘটনা কখনও কখনও ঘটিতে দেখা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। যাঁহারা কল্পনার আশ্রয় না লইয়া অতি যথাযথভাবে এই সব ঘটনা সাধারণ সহজ জীবনযাপনপন্থী অথবা কেবল কল্পনাবিলাসী ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত করেন তাঁহারাও এই শ্রেণীর লোকের স্বভাবসুলভ হালকা সমালোচনায় উদ্‌ব্যস্ত বোধ করেন। মনুষ্যজীবনের বাস্তব-বৈচিত্র্যও যেমন সময় সময় কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তেমনই বন্য জগতেও এরূপ ঘটা বিস্ময়কর নহে। ইহা মনে রাখিলে আপাততঃ অবিশ্বাস্য ঘটনাও অন্য দৃষ্টিতে দেখা চলে। কর্ম্মবিমুখ পাণ্ডিত্যাভিমানী বুদ্ধিজীবির সাহায্যে অদৃষ্ট জগতের রমণীয় ও মোহকারী চিত্র আমাদের দেশে নানা কারণেই সহজলভ্য হইলেও পাশ্চাত্য দেশীয় জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মসাধনপুষ্ট লোকের রচিত সত্য ও রসপুষ্ট রচনার পাশে সেইগুলির মেকি রূপ জ্ঞানী সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় না। আমাদের দেশে বিজ্ঞানী মনোবৃত্তি গঠিত না হওয়ায় রচনাসৌষ্ঠব না থাকিলে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণতঃ কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। লৌকিক জ্ঞানকে অনভিজ্ঞ লেখক যখন সাহিত্য পদবাচ্য করিবার অপচেষ্টা করিতে যান তখন রচনাকে সাহিত্যরসিক ও বৈজ্ঞানিক দুয়েরই নিকট সমভাবে অস্পৃশ্য করিয়া তোলেন। সুতরাং পাঠকবর্গকে প্রথমেই সতর্ক করিব—এই প্রবন্ধে লিখিত ঘটনা সত্যই ঘটিয়াছে, সাহিত্যিক পত্রিকার জন্য অসাহিত্যিক ও অবৈজ্ঞানিকের লেখা হওয়ায় তাহা যেন অসত্য বলিয়া উপেক্ষিত না হয়। এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত ঘটনা কাল্পনিকের মোহগ্রস্ত দৃষ্টি লইয়া দেখা নহে, ভরা বর্ষায় আসামের বনের ভিতর হাতী শিকারের চেষ্টায় ভ্রাম্যমান ব্যক্তির কষ্টার্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখা সত্য ঘটনার বর্ণনা।

লেখকের বহু কারণে হাতীর সম্বন্ধে উৎসাহী হইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত হাতীর প্রতি একটা মোহকারী ভালবাসার ভাব লইয়া চলিয়াছিলাম—যথেষ্ট উত্তেজক কারণ সত্ত্বেও জগতের লুপ্তপ্রায় বিরাট প্রাণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই

অতিকায় জন্তুগুলিকে সংহার করিবার ইচ্ছা আদৌ হয় নাই। এই প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ স্বাভাবিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কেন ইহাদের বিনাশে উদ্যত হইলাম তাহার উল্লেখ এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তবে এইটুকু বলা চলে যে এই পরিবর্ত্তন ঘটায় হাতীর দলের ভিতর আরও সাহস করিয়া গিয়া তাহাদের বিচিত্র জীবন-যাপনের সহিত বিশেষ পরিচিত হইবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছি। হাতী শিকার করিতে গিয়া হাতীর ভিতর সহানুভূতির প্রাবল্য কিরূপে প্রায় প্রাণের মায়ার কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া দেয় তাহার যে এক সুন্দর চিত্র দেখিয়াছি, তাহারই বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

(২)

গত বৎসর ভাদ্র মাসে গারো পাহাড়ের ডেপুটী-কমিশনার মিঃ মিত্র জানাইলেন যে রংগিরাপ্রিয়া গিরিতে দুইটি 'গুণ্ডা' হাতী লোকজনের কৃষি ও গৃহাদি নষ্ট করিতেছে। সংবাদ পাওয়ায় তিনি উহাদিগকে বিনাশ করিবার হুকুম দিয়াছেন—হাতী মারিবার হুকুম থাকায় আমি উহাদিগকে বধ করিয়া দন্তচতুষ্টয় লইতে পারি।

আজকাল 'রোগ' হাতীর সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঘটনার নানাপ্রকার উল্লেখ, সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে প্রায়ই দেখা যায়, ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট 'গুণ্ডা' হাতী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বাস্তব ও অবাস্তব ধারণা জন্মায়। 'খুনে' হাতী সম্বন্ধে বিশেষ নূতন কোনও তথ্যের উল্লেখ করিয়া সেই ধারণার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিব না। হাতীশিকারের অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ইহার পূর্ব্বে দুইটি হাতী মারিবার উদ্দেশ্যে গুলি করিয়াছি এবং দুই ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করিয়াছি। শিকারী নূতন না হইলেও হাতী শিকার আমার নিকট নূতন; সুতরাং নূতন শিকারীর সৌভাগ্যই বোধ হয় আমার সাফল্যের পক্ষে এযাবৎ সহায়ক হইয়াছে। যাহাই হউক সাফল্যের আনন্দে সহজেই ধরিয়া লইয়াছিলাম, যদি হাতীর দেখা পাই তাহা হইলে এযাত্রাও সাফল্য সুনিশ্চিত।

'খুঁজি' পাঠাইয়া দিয়াছি, হাতীর নিশ্চিত অনুসন্ধান জানিতে। যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে হাতীসিয়া গিরিতে হস্তী দেখা দিয়াছে। হাতীসিয়া গিরি সুসঙ্গ হইতে ২২।২৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত—গারো পাহাড়ের ভিতর। স্থানটি আমার পরিচিত। কিন্তু যে কারণেই হউক এখানে যে কয়বার যখনই উপস্থিত হইয়াছি এবং যতদিন অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছি ততদিন এবং

ততবারই বৃষ্টি পাইয়াছি! এই হাতীর সংবাদ আমি পূর্ব্বেও জানিতাম। কিন্তু আমার জানা ছিল যে এই হাতীর সঙ্গে একটা হস্তিনীও থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র দুইটি দন্তী 'রোগে'র কথা শোনায় কিছু সন্দেহের উদ্রেক হইতেছিল। প্রথমে গারো পাহাড়ের পাদদেশে বনবেড়া নামক স্থানে মূল ছাউনী করিয়া, হাতী যে সকল লোকের বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে ও ক্ষতি নষ্ট করিয়াছে, তাহাদের ভিতর যাহারা খুনী হাতী দুইটিকে নিশ্চিতরূপে চেনে সেইরূপ কয়েকজন লোক সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করিলাম।

বনবেড়ার তাঁবুর স্থান হইতে হাতীসিয়া—যেখানে থাকিয়া হাতী শিকার করিবার কল্পনা করিয়াছিলাম—তাহার দূরত্ব প্রায় ৬ মাইল। সেখানে নেপালীদের একটা গরু ও মহিষের বাথান আছে। পাহাড়ের উপর বাথান হইতে যে পথে প্রত্যহ দুধ নামাইয়া আনে সেই পথেই আমাদের যাইতে হইবে। শুনিলাম দুই দিন হাতীর উৎপাতে দুধ নামান সম্ভবপর হয় নাই। আমরা নেপালীদের বাথানের নিকটেই কোনও স্থানে থাকিব—নতুবা পানীয় জল পাওয়া কঠিন হইবে। আমাদের সঙ্গে কেবলমাত্র নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ভিন্ন অন্যান্য সমস্তই বনবেড়ায় মূল ছাউনীতে রাখিয়া গেলাম।

নেপালীদের বাথানের কিছু উচ্চে আমাদের তাঁবু খাটাইয়া আস্তানা করার পর হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকায় এখানে হাতী শিকার করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ততক্ষণে হাতীও এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে। পঞ্চম দিনে বারিপাত কিছু প্রশমিত হইলে আমরা খারনৈ নদীর অপর পারস্থিত খুসিগিরি নামক বস্তিতে 'আলুডা' করিয়া শিকার চেষ্টা করিব স্থির করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলাম। বর্ষায় পাহাড়-পথ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর পিছল ও জোঁকের উৎপাত, পথ চলা অতি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য গত ৪ দিন পাহাড়বাসে কষ্টের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে নিজেদের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আস্থা জন্মিয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। মধ্যে মধ্যে ঘন বনের আড়াল হইতে রৌদ্র-কিরণোজ্জ্বল, নব-জলসিঞ্চনপুষ্ট গর্জ্জনশীল ঝরণাগুলি তাহাদের জীবন্ত উল্লাসে প্রাণে পুলকের সাড়া জাগাইতেছিল। পথে এক জায়গায় সংবাদ পাইলাম যে রংথ্রিয়াপ্রিয়া গিরির জঙ্গলে কয়েকটা হাতী বাঁশ ভাঙ্গিয়া খাইতেছে। হাতী কয়টা গত রাত্রিতে খুসিগিরির দিক হইতে পার হইয়া আসিয়াছে। আমরা আসিবার সময় পাঞ্জালীদিগকে (অর্থাৎ ট্র্যাকারদিগকে) রংথ্রিয়াপ্রিয়া প্রভৃতি জায়গায় খোঁজ করিয়া খুসিগিরিতে যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম; সুতরাং

আমাদের আশা ছিল পাঞ্জালীগণ এখানকার সংবাদ অবশ্যই লইয়া যাইবে। আমরা প্রায় বেলা দুইটার সময় খুসিগিরি বস্তিতে পৌঁছিলাম। গ্রামে লোক নাই সব হাদাং-এ (অর্থাৎ ক্ষেত্রে) চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ষার কয়মাস গারোগণ ক্ষেত পাহারা দিবার জন্য ক্ষেতের ভিতর মাচান (বোরং) বাঁধিয়া তাহাতেই বাস করে। ক্বচিৎ কখনও গ্রামে আসিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া যায়। একটি লোক তখন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহার নিকট খোঁজ পাইলাম গত রাত্রিতে হাতী নদী পার হইয়া রংথ্রিয়াপ্রিয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে প্রাপ্ত খবরের সহিত ইহার মিল ছিল।

(২)

আজ বেশ রোদ উঠিয়াছে—খুসিগিরির এক ধার দিয়া খারনৈ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামগতিতে পাথরের উপর দিয়া আছড়াইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; আর অপর দিক হইতে একটা স্রোতস্বিনী ভীষণ বেগে পাথর ঠেলিয়া আসিয়া মিশিয়াছে খারনৈ নদীতে। সুন্দর জল, নয়নাভিরাম দৃশ্য, পাথরের উপর বসিয়া ধ্যান করা চলে। যাহাই হউক আমরা তপস্বী নহি, সুতরাং এখানে শুধু ভাল করিয়া স্নান করার ইচ্ছা হইল। স্নান করিয়া আমাদের জিনিষপত্র সব রৌদ্রে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় এক পাঞ্জালী আসিয়া সংবাদ দিল যে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে হাতীর খোঁজ হইয়াছে, আমরা যেন অবিলম্বে চলিয়া আসি।

উল্লেখ করা ভাল যে ইতিপূর্ব্বেই আমরা গ্রামস্থ পাঠশালার সম্মুখস্থ পরিষ্কার প্রাঙ্গনে আমাদের জিনিষপত্র সমস্ত রাখিয়াছিলাম। গারো পাহাড়ে প্রায় গ্রামেই একটা উঁচু মাচান থাকে। সেটা গ্রামের অবিবাহিত পুরুষগণ এবং যে কোনও অতিথি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে গারোরা 'নকপান্থি' বলে। নকপান্থিটি অতি পরিষ্কার এবং অন্য কোনও লোক না থাকায় আমরা তাহাতেই রাত্রিযাপন করনা করিয়াছিলাম। নকপান্থির সম্মুখে একটা কাঁটা গাছের উপর বসিয়া রোদ পোহাইতেছি এমন সময় দেখি প্রায় হাতখানেক লম্বা সবুজ রংএর চেপ্‌টা-মাথা এবং অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের একটা সাপ হাঁ করিয়া ছিট্‌কাইয়া ছিট্‌কাইয়া আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামড়াইতে আসিতেছে। লাঠির ঘায়ে সাপ মারা হইল। কিন্তু সাপটা সম্পূর্ণভাবে সংহার করিতে শ্রীমান বিমলকে ৫।৬ বার আঘাত করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে ২।৪ ফোঁটা কার্ব্বলিক অ্যাসিডও ক্ষয় করিতে হইয়াছে। সাপ মারিলে শিকার পাওয়া যায় এ সংস্কার থাকায় আমরা বিশেষ উৎফুল্ল হইলাম।

আমরা কালবিলম্ব না করিয়া হাতীর উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। খারনৈ নদী প্রায় সাঁতার দিয়া পার হইয়া অপর পারে পৌছিয়া অন্য খুঁজিয়া যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে পৌছিতে প্রায় ৪½ টা বাজিয়া গিয়াছিল। তাহারা এক উঁচু গাছে বসিয়া হাতীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আমরা নিকটে আসিতেই চুপ করিতে ইসারা করিয়া গাছ হইতে ক্ষিপ্র নামিয়া আসিল। ইসারা করিল হাতী অদূরেই আছে। আমরা গুলি ভরিয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম, এখন উৎকণ্ঠায় অস্থির হইলাম। হাতী এত চুপ করিয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারে যে ৫।৬ গজ দূরে বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় নাই।

অতি সন্তর্পণে জিরাং পাঙ্গালী অগ্রসর হইতেছে আর তাহার পিছনেই চলিয়াছি আমরা। হঠাৎ একটা ছোট ডাল ভাঙ্গার শব্দ হইল, আবার সব চুপ। পাঙ্গালী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শব্দের হেতু নির্ণয়ের চেষ্টা করিল। এই মুহূর্ত্তে শিকারীর কি ভাব তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা কঠিন। তখন নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দই নিজেরই কাণে ভয়ানক জোর বলিয়া বোধ হয়—উৎকণ্ঠা য়ুনিভার্সিটির অঙ্কের প্রশ্ন পাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ভাবের চেয়েও বোধ হয় জটিলতর হইয়া উঠে! আমরা চারিদিক লক্ষ্য করিয়া সুবিন্যস্ত ঘন বাঁশবনের ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ধীরে ধীরে এদিকে সেদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ২।১ পা অগ্রসর হইতেছি, হঠাৎ জিরাং চুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। বুঝিলাম হাতী দেখিয়াছে। হাতীটা একটা বাঁশ গাছের ধারে দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু এমন কাদা মাটি মাখিয়া রহিয়াছে যে তাহার রং পাহাড়ের রংএর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তারপর হাতীটা একেবারে পাথরের মত নিশ্চল—সুতরাং হঠাৎ দেখিয়া বুঝিবার কোনও উপায়ই নাই। একটু নড়িলে বুঝিলাম এটা পাহাড় কিম্বা পাথর নয়, হাতীই ঠিক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও হাতীর দাঁত কিছুতেই দেখিতে পাইতেছি না। ঠিক আমাদের বাঁ ধারেই একটা শুকনা পাথর-চাকা নালা গিয়াছে—বিমল তাহাতে নামিয়া হাতীটাকে খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়া আমাকে সেই দিকে যাইতে ইসারা করিল। আমি নালায় নামিয়াই হাতীটাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। তখন আজাম ও গাগাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এই হাতীই তাহাদের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে কিনা এবং ডেপুটী-কমিশনার যে হাতী বধের হুকুম দিয়াছেন এই হাতীই সেই হাতী কিনা? তাহারা মাটি ছুঁইয়া শপথ করিল এই হাতীই সেই বড় গুণ্ডা হাতীটা। তখন মুহূর্ত্তকালমাত্র বিবেচনা করিলাম কোথায় গুলি করিব। হাতীটা তখন আমাদিগকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ অথচ বিরক্তি-

পূর্ণভাবে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—অনুমান করিয়া ডান চোখের কিছু উপরে একটু বাঁ দিক ঘেঁষিয়া কপালের নিকট গুলি করিলাম। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এক ধাক্কা খাইয়া ঠিক উল্টা দিকে ঘুরিয়া যাইবার সময় পুনরায় এক গুলি হইল মাথায়। তখন হাতীটা আমরা প্রথমে যেখানে বসিয়া হাতী দেখার চেষ্টা করিয়াছিলাম সেই দিকে ঘুরিয়া ঠিক হরিণের মত বেগে পলায়নপর হইল—আবার একটা গুলি হইল। এই গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা ঠিক যেন কাৎ হইয়া উল্‌টাইয়া পড়িল। আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া পতিত হস্তী লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখি হাতী সেখানে নাই—পতনের চিহ্ন রহিয়াছে এবং বেশ খানিকটা রক্ত পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতী নাই। প্রথম দুই গুলি ৩০ গজ ব্যবধানে করা হইয়াছে, শেষের গুলি হইয়াছে প্রায় ৪০ গজ দূর হইতে। ইহার পূর্ব্বে এক হাতী ৬০ গজ দূর হইতে মারা হইয়াছে এবং অপরটি প্রায় ১৫ গজ দূর হইতে। কিন্তু সেই দুইটির প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠিক এক এক গুলিতেই নিহত হইয়াছিল। সুতরাং তিনটা গুলির পরও হাতী মরিল না দেখিয়া মনে বেশ ধাক্কা খাইলাম। কিন্তু স্থির বিশ্বাস হইল আর একটু ঘুরিয়া দেখিলে হাতী এখনই নিকটেই পাইব।

(৩)

সঙ্গে দুই বন্দুকধারী ও দুই পাঙ্গালীকে লইলাম অপর সকলকে বলিয়া দিলাম তাহারা হাতীর মলমে (পথে) উত্তর দিকে গাছে বসিয়া যেন শব্দ করিতে থাকে। আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইলে যেন তাঁবুতে ফিরিয়া যায়। আহত হস্তীর অনুসরণ করা কখনও নিরাপদ নহে। বাঘের হাতে রক্ষা পাইলেও অতি শক্তিশালী রাইফ্‌ল্ হইতে সময় মত গুলি করিতে না পারিলে আক্রমণশীল হাতীর হস্ত হইতে আমাদের মত মন্থরগামীদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। পায়ে হাঁটিয়া হাতী শিকারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উন্মাদনাই এই যে, এই শিকার করিতে গেলে আপন জীবন পণ করিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমার অপর সঙ্গীদ্বয়ও যথেষ্ট সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এই অবস্থাতেও কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। আমার রাইফ্‌ল্ কোনটাই হাতী শিকারের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল না—সুতরাং ইহাতে বিপদের মাত্রা অত্যধিক।

সময় বেশী ছিল না। পাহাড়ে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। বর্ষার নিবিড় বনানীপূর্ণ পথহীন পিচ্ছিল পাহাড়ে চলার অভিজ্ঞতা যিনি অর্জ্জন করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আমাদের অবস্থা বুঝিবেন।

অতি নিকটেই অন্য হাতীর বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ শুনিয়া মনে হইল আহত হস্তী অপর হস্তীর দিকে গিয়াছে, ফলে দুইটিই রক্তের গন্ধে ও বারুদের গন্ধে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে। হাতীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি ক্রমশঃ নিবিড় বনানীর ভিতর। সেখানে বোধ হয় রৌদ্র মধ্যাহ্নেও কখনও প্রবেশ করে না। মশা এবং নানাবিধ পচা গাছের দূষিত বায়ুতে অবস্থা আরও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছিল। এ কয়দিন পাহাড়ে চলিয়া জোঁকের অবিশ্রান্ত উৎপাত সহিয়া গিয়াছিল। আমরা হাতীর পথে চলিতে চলিতে দেখিলাম যে এক জায়গায় হাতীগুলি আমাদের ঠিক ৫।৬ হাত ব্যবধান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে ঘন বন থাকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই—অথচ হাতী চলার কোন শব্দও পাই নাই। প্রত্যেক পা চলি আর আশা করি এই বুঝি দেখা পাই। এক এক জায়গায় হাতীর পদস্খলনের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয় হাতী খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, বুঝি বা সম্মুখেই শায়িত অবস্থায় পাইব। কিন্তু একটু চলার পরই ভুল ভাঙ্গিয়া যায় যখন দেখি আমরা যেখানে কষ্টে উঠিতে পারি এমন পাহাড়ও হাতী সহজেই পার হইয়া গিয়াছে। কোথাও গাছের পাতায় রক্তের দাগ—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে বিদ্ধ দাঁতের দাগ দেখিয়া মনে হয় পতনোন্মুখ হস্তী কোনও রকমে দাঁতের সাহায্যে টাল সামলাইয়া লইয়াছে। এমন বহু চিহ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছি, পর-মুহূর্ত্তেই আবার তাহার সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। এ ভাবে কিছুক্ষণ অনুসরণ করার পর সূর্য্যদেব পাহাড়ের পাশে গা ঢাকা দিলেন। সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন বনে মুহূর্ত্তকাল থাকাও সম্পূর্ণ নিরর্থক, বিপজ্জনক ও মূর্খতা বোধে কাঁটা-বনে জামা, প্যাণ্ট ও হাতপায়ের চামড়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কোনও মতে থারনৈ নদীতে আসিয়া নামিলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে পর্ব্বত ও অরণ্য এক ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সবচেয়ে কষ্টদায়ক মশা, 'উনি' পোকা ও অন্যান্য নানাপ্রকার পোকার কামড়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জোঁকের কামড় গা সহা হইয়া গিয়াছে। বর্ষায় অত্যন্ত সর্পভীতি হয়। কিন্তু এখন যে অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে কোনও ভীতিই আর মনে ছিল না। সঙ্গে একটা টর্চ্চ পর্য্যন্ত ছিল না। এ অবস্থায় একমাত্র মনে হইতেছিল যে উপায়েই হউক যত শীঘ্র হয় তাঁবুতে পৌছিতেই হইবে। সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া লতা গাছ ধরিয়া ধরিয়া কোনও মতে প্রায় এক ঘণ্টার পথ চলিয়া একটা পুরাতন পায়ে-চলার পথ পাইয়া বাঁচিলাম, আর অল্প সময়েই পথে বহুবার হোঁচট খাইয়া খুসিগিরি পঁহুছিলাম। আজিকার এই পরিশ্রম যে কোনও অতি কঠোর পরিশ্রমীর পক্ষেও আত্মপ্রসাদের ভাব আনিয়া দিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

রাত্রিতে আজি চা পান ও দধিচিঁড়ামাত্র ভক্ষণ হইল। পাক করিয়া খাওয়ার ইচ্ছা আর ছিল না। কিন্তু বহুদিন পরে জলে না ভিজিয়া, পোকা ও জোঁকের উৎপাতে অতিষ্ঠ না হইয়া সুখে সমস্ত রাত্রি গাঢ় নিদ্রা উপভোগ করিলাম নক্‌পান্থিতে শুইয়া। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও নক্‌পান্থিতে বাস করি নাই। গারোদের মধ্যে ভয়ঙ্কর চর্ম্মরোগ হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবহৃত এই সকল স্থানে থাকার কথা মনে হইলেও ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেক হইত। কিন্তু আজ আর এ সব কথা মনেও হয় নাই। আমরা যে সকল লোককে গাছে উঠিয়া থাকিতে বলিয়াছিলাম তাহারা অনেক রাত্রিতেও না আসায় মনে করিলাম তাহারা রংথ্রিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ নিশ্চয় রাত্রি কাটাইয়াছে।

পরদিন খুব প্রত্যূষে উঠিয়া কি ভাবে কার্য্য করা হইবে তাহার একটা খসড়া স্থির করা হইল। শিকারী দল হাতীর যাওয়ার পথে অনুসরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে রংথ্রিয়াস্রিয়া গিরির হাদাং-এ ফিরিবেন। পাঞ্জালীর দল অন্যান্য সম্ভবপর স্থান খুঁজিয়া সেইদিন অথবা তার পরদিন সন্ধ্যায় রংথ্রিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ আসিয়া মিলিবে। চারিজন বেগার দিয়া ছয় বেলার খিচুড়ীর মালমশলা, চায়ের সরঞ্জাম, কয়েকটা টর্চ্চ, ঔষধের বাক্স, মশারী, দুইটা ত্রিপল, এইরূপ সামান্য জিনিষ দিয়া তিন দিন কাটানোর মত উপকরণ সহ রংথ্রিয়াস্রিয়ার হাদাং-এ পাঠাইয়া দিলাম। তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া দিলাম গারোদের পরিত্যক্ত কোনও পুরাতন 'বোরং'-এ যেন তাহার মালপত্র রাখিয়া শুক্‌না কাঠ যোগাড় করিয়া জায়গা পরিষ্কার করিয়া রাখে। অপর লোকগুলি ইত্যবসরে আসিয়া বলিল যে রাত্রি হইয়া যাওয়ায় তাহারা রংথ্রিয়ার হাদাং-এ ছিল। দুইটি হাতী প্রথমেই তাহাদের গাছের নীচ দিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। আহত হস্তী ধীরে ধীরে কষ্টে অনেকক্ষণ পরে তাহাদের পথেই ঠিক গাছের নীচ দিয়াই গিয়াছে—হাতীর কপাল এবং শিরদাঁড়ার নীচে পিছনে ডান দিক হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতেছে। হাতী খুবই আহত হইয়াছে। তাহাদের মতে হাতী বাঁচিবে না।

আমরা শীঘ্র আহারাদি করিয়া ব্যবস্থামত রওনা দিলাম। বাকি সকলকে মালপত্র সহ খুসিগিরিতে রাখিয়া বলিয়া গেলাম—আমরা যদি কোনও চিঠি পাঠাই তাহা হইলে পত্রের মর্ম্মানুযায়ী ব্যবস্থা তাহারা যেন করে।

হাতীর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম আহত হস্তী অপর দুইটির সহিত মিলিত হইয়াছে। পথ চলার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল যে প্রথমত এইটি অপর দুইটির সহিত মিলিত হইতে চাহিলেও কেন যেন অপর দুইটি ইহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু একটা নরম এঁটেল মাটির মত কর্দ্দমাক্ত স্থানের নিকট

আসিয়া মনে হইল হস্তিনী অপর হস্তীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহত হস্তীর সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রথমে অনাহত দুইটি একটা নূতন পথ দিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। উহাদের মধ্যে গুণ্ডাটি আর ফিরে নাই, কিন্তু 'কুন্‌কী' (অর্থাৎ হস্তিনী) আসিয়া আহত হস্তীর সহিত মিলিয়াছে। এই স্থান দেখিয়া ইহাও মনে হইল যে রক্ত বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মাটি লইয়া আহত স্থানে দিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাটিতে শুঁড়ের চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইল উভয় হস্তীই শুঁড় দিয়া মাটি তুলিয়াছে। ইহার পর বৃক্ষপত্রাদিতে রক্তের চিহ্ন প্রায় দেখি নাই। এখন হইতে এই দুই হাতীর পথ আর বিভিন্ন হয় নাই। অপর গুণ্ডাটি মধ্যে মধ্যে এই পথে চলিলেও প্রায় সময়েই অদূরেই এক স্বতন্ত্র পথে গিয়াছে। কখনও এই দুইটির আগে গিয়াছে—কখনও পশ্চাতে। দেখিয়া অনুমান করিলাম অপর গুণ্ডাটি অতি অল্পসময় ইহাদের নিকটে আসিলেও প্রায় সময়ই ভিন্ন পথে গিয়াছে। প্রায় চারি ঘণ্টা কাল হস্তীর পথে অনুসরণ করিয়াও যখন হস্তীর দেখা পাইলাম না তখন অসময় হইয়া যাইবে ভয়ে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট 'হাদাং'-এ ফিরিবার কল্পনা করিলাম। পথে কোনও হাতীর শোয়া অথবা খাওয়ার চিহ্ন পাইলাম না। তাহাতে অনুমান হইল হাতী সমস্ত রাত্রিই কেবল চলিয়াছে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

এখন পর্য্যন্ত আমরা হাতীর পথেই চলিয়াছিলাম সুতরাং লতাবল্লরীর বেড়াজালের উৎপাত এতটা হয় নাই। পথ চলা কতক পরিমাণে সহজই মনে হইয়াছে। তারপর হাতীর পথ ছাড়িয়া সোজা জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। কত রকমের লতার বন্ধন, একটু অসতর্ক হইলে কোনটা গলায় জড়াইয়া যায়, কোনটা পায়ে লাগিয়া যায়, কোনটায় বন্দুক আটকাইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে নানা অদ্ভুত কাঁটার গাছ। কখনও পিচ্ছিল পথে পদস্খলন হইয়াছে, কোথাও কাঁটার আঁচড়ে কাপড় জামা ও শরীর কাটিয়া গিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার দুর্ভোগ ভুগিতে ভুগিতে পর্ব্বতশিখরে মানুষের পুরাতন পথ পাইলাম। এই পথ ধরিয়াই হাতী 'হাদাং'-এ ধান খাইতে যায়। সুতরাং পথটা কিছু সুগম হইয়াছে। পাহাড়ে ৩।৪ ঘণ্টা ক্রমাগত চলিবার পর, বিশেষতঃ শিকারের অন্বেষণে বাহির হইলে, কেমন যেন একটা 'খুন চাপা' ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন শারীরিক কষ্ট ও শ্রম বড় একটা উপলব্ধি হয় না। যখন 'হাদাং'-এ উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ৩½ টা বাজিয়াছে। পাহাড়ের জঙ্গল কাটিয়া প্রায় খারনৈ নদী পর্য্যন্ত 'হাদাং' করিয়াছে। উপরের অংশে প্রায় জায়গার ধান হাতী খাইয়া নষ্ট করিয়াছে। নীচের দিকের ধান বেশ আছে। দুই একটা

'বোরং'ও হাতী ভাঙ্গিয়া শেষ করিয়াছে। প্রায় গাছেই মাচান ও মই বাঁধা আছে, হাতীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

ধান পাকায় ধান সংগ্রহের জন্য গারো রমণীরা মাথায় ঝুড়ি ('খক্ বা জোঙ্গ') বাঁধিয়া ঘুরিতেছে, কেহ কেহ বোরং-এ বসিয়া ধান ভানিতেছে। বিস্তীর্ণ হাদাং-এ মোটে ৭।৮টি বোরং। ক্ষেতে ধান, ফুটি, কাঠ আলু, রাঙ্গা আলু, কার্পাসতুলা, 'চুকাই', কচু, মরীচ, ভূট্টা, কাংনীদানা প্রভৃতি লাগান হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে মিষ্টিকুমড়া, লাউ, চালকুমড়া প্রভৃতির গাছও আছে। গারো রমণীরা ধান কাটে না, পাকা ধানের শীষ্ বাছিয়া বাছিয়া ছিঁড়িয়া লয়।

সংবাদ পাইলাম কোনও বোরং খালি না থাকায় মুক্ত আকাশের তলে রাত্রিবাস করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। জলও অনেক নীচে; জলের জন্য প্রায় ৪৫ মিনিট পথ নামিতে হইবে। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখানে এক বাল্‌তি জল আনিতে ১½ ঘণ্টা সময় যাইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম স্থির হইল আজ রাত্রিতেও চিঁড়া ভক্ষণ করা, কারণ জল আনিয়া রান্না করা অসম্ভব; জায়গাটাও অতি খারাপ, সেখানে বসিয়া রন্ধন করাও চলে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি এক বাল্‌তি জল আনার ব্যবস্থা করিয়া চা পানের উদ্যোগ হইল এবং কতকটা বন সাফ করিয়া সেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হইল। ত্রিপাল দিয়া সঙ্গের জিনিষপত্রগুলি ঢাকিয়া রাখা হইল। লেখা অনাবশ্যক, সন্ধ্যাগমের সঙ্গে সঙ্গে মশা প্রভৃতির ভীষণ আক্রমণ সুরু হইতেছিল। আমি প্রতিষেধক হিসাবে প্রত্যহ কুইনাইন খাইতাম, কিন্তু সঙ্গীগণ পুনঃ পুনঃ সাবধান করা সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে অসতর্ক ছিলেন। ফলে বাড়ী ফিরিয়া কেবল আমিই ম্যালিগনেণ্ট ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। অন্য সকলেই অল্পবিস্তর ভুগিয়াছে। এমন কি দরোয়ানও বাদ যায় নাই।

ইতিমধ্যে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জালীগণ আসিয়া বলিল যে তাহারা প্রায় ৩।৪ মাইল দূরেই হাতী দেখিয়া আসিয়াছে। হাতী অত্যন্ত "কাবু" (অর্থাৎ গুরুতর-রূপে ক্লিষ্ট) হইয়াছে। খুব ধীরে ধীরে চলে, কান অথবা ঘাড় প্রায় নাড়াইতে পারে না, শুঁড় ও লেজ নাড়ায় না। হস্তিনী আহত হস্তীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর মধ্যে মধ্যে শুঁড় দিয়া আহত স্থানে মাটির প্রলেপ দেয় অথবা মাটি গুঁজিয়া দেয়। মানুষের শব্দ পাইলেই হস্তিনী মরিয়া হইয়া আক্রমণ করে। তাহাদের মতে হাতীর যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে খুব বেশী চলিলেও হেমদাঙ্গির ছড়ার নিকটে কর্দ্দমাক্ত স্থানেই পাওয়া যাইবে। তাহাদের মতে কাল সূর্য্যোদয়ের পর ছড়ার ধারেই হাতী নিশ্চিত পাওয়া যাইবে। এই সংবাদে শিকারের সাফল্যের

আশায় যেমন উৎফুল্ল হইলাম তেমনই আবার হাতীর জীবনের নূতন একটা পরিচয় পাইয়া কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতিতে আবেশ-বিহ্বল হইয়া রহিলাম! এই জগৎ বিচিত্র! প্রকৃতির লীলা বিচিত্র!

এই গ্রামের গাগাকে আমরা পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত করিয়াছি। সে পাঞ্জালীদের সঙ্গে ফিরিলে তাহার চেষ্টায় ও তাহার স্ত্রীর সৌজন্যে রাত্রির জন্য আমাদের মাথা গুঁজিবার স্থান জুটিল। উৎসাহে সে পাঞ্জালীদিগকে সমস্ত রাত্রি প্রচুর মদ্য পানে আপ্যায়িত করিল। আমি সারা রাত্রিই ভাবিতে লাগিলাম,—একি সত্য যে হাতীর এত বুদ্ধিমিশ্রিত মায়া আছে!

শিকারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভারে নয়নমন যেমন সার্থকতার পরিপূর্ণতা লাভ করে তেমনই বনবাসী মনুষ্যসমাজের জীবনযাত্রার সহিতও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

(৪)

খুব সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইলাম। পাঁচ জন পাঞ্জালী ভিন্ন দুইজন কুলিকে সঙ্গে লইলাম। কুলির সঙ্গে এক টিফিনক্যারিয়ারে দধি, চিঁড়া, গুড় ও ফ্লাস্কে জল, ২টা টর্চ্চ দিয়া দিলাম। যদি হাতীর পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে জঙ্গলে রাত্রি হয় তাহা হইলে এগুলি কাযে লাগিতে পারে।

যে দিকে হাতীর পলায়নের স্বাভাবিক গতি হইবে অনুমান করা গেল, সেই ঘাঁটিতে একজন বন্দুকধারীকে রাখিলাম এবং অপর দুই তিন ঘাঁটিতেও গাছে গাছে ২।১ জন লোক রাখিয়া দিলাম। হাতী পলায়নপর হইলে তাহারা যেন সেই পথ হইতে ভয় দেখাইয়া হাতী ফিরাইয়া দেয়। বন্দুকধারী ভদ্রলোক গাছে উঠিতে পারেন না, বহুকষ্টে তাঁহাকে গাছে তুলিয়া গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যেন ভয়ে গাছ হইতে পড়িয়া না যান।

এই সব কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা তিন জন পাঞ্জালীকে লইয়া হাতীর উদ্দেশ্যে হেমদাঙ্গি ছড়ার দিকে নামিতে লাগিলাম। সোজা পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া নামিয়া চলিয়াছি। চারিদিকে সাজান বাঁশ বন। নীচে ছড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছে। হঠাৎ একটা বাঁশ ভাঙ্গার অস্পষ্ট শব্দ কাণে আসায় একজন পাঞ্জালীকে গাছের উপরে উঠিয়া হাতীর সাড়া পাওয়া যায় কিনা দেখিতে বলা হইল। লোকটা ঠিক বাঁদরের মত সহজে গাছের উচ্চতম চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে নামিয়া আসিয়া বলিল, কিছু নীচেই বড় দাঁতাল "গোগাবা" (অর্থাৎ গুলিখাওয়া) হাতীটা হস্তিনীর সঙ্গে ধীরে ধীরে আসিতেছে। দেখিয়া মনে হইল বড় হাতীটা ২।১টা

নলাগ্র ধীরে ধীরে শুঁড় দিয়া মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে। হস্তিনী কিন্তু তাহার গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে এবং এক এক বার হাতীর মাথায় শুঁড় বুলাইয়া মাটি দিতেছে। পাঞ্জালীকে পুনরায় গাছে চড়িয়া চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া আমরা আরও নামিয়া গেলাম। ২৫।৩০ গজ নীচে ছড়া দিয়া ধীরে ধীরে হস্তী অগ্রসর হইতেছে—হস্তী ও হস্তিনী উভয়কেই দেখিলাম। অপর পাশ দিয়া হস্তিনী ইহার গা ঘেঁষিয়া আসিতেছে। হস্তীর অন্য কোনও নড়-চড় টের পাইলাম না, কিন্তু ক্লিষ্টগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ধীরে ধীরে কাণ পর্য্যন্ত সমস্ত মাথা বাহির হইয়া আসিল।

শিকারে প্রায়ই প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র গুলি না করিলে আর পাওয়া যায় না। হাতীর মর্ম্মস্থলের সুযোগ ইহার চেয়ে আর হইতে পারে না—সুতরাং লক্ষ্য করিলাম। আমরা সোজা উপরে ছিলাম, সুতরাং গুলি করিতে হইলে মদস্রাবের ছিদ্রের উপরে যে হাড় আছে তাহার কিছু উপরে করিতে হয়। কিন্তু আমার বন্দুকের নলে গুলিটা 'সফট্ নোজ' ছিল। অবশ্য ম্যাগাজিনে 'হার্ড নোজ' ছিল—বদলাইতে গেলে শব্দে কুফল হইবার আশঙ্কা। অপর রাইফলেও দুইটিই 'সফ্‌ট্ নোজ'। সুতরাং মদস্রাবের ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে বাধ্য হইলাম। মনে করিয়াছিলাম হাতীকে উল্টাইয়া ফেলিতে এই গুলিই যথেষ্ট হইবে, তাহার পর দ্বিতীয় গুলি প্রয়োজন হইলে 'হার্ডনোজ' ব্যবহার করা যাইবে। কিন্তু গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাতী মাথা ঘুরাইয়া পলায়নপর হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি গুলি হইল। পাঞ্জালী গাছের উপর হইতে ডাকিয়া বলিল, হাতী উত্তরদিকে লোকেন্দ্রবাবুর পথে চলিয়াছে—সঙ্গে হস্তিনী আছে। খুব বিশ্বাস ছিল গুলির ধাক্কায় হাতী পড়িয়া যাইবে, তাহা না হওয়ায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

হাতীর পিছনে পিছনে যথাসম্ভব দ্রুত চলিলাম। চলা কি যায়! উঁচু নীচু পাহাড়ের পথ। এই সুবৃহৎ জন্তুগুলি যে দ্রুতগতিতে এই পথ দিয়া যায় তাহার আংশিক বেগে চলিতে পারিলেও হয়ত হাতীর নিকটে যাওয়া সম্ভবপর হইত—কারণ হাতী মধ্যে মধ্যেই দম লইয়া চলিতেছিল। কিছুদূর চলিতেই উত্তরের পথ হইতে চীৎকার শোনা গেল যে হাতী সেই দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হাতী ফিরাইয়া দিবার জন্য লোকেন্দ্র বাবু একটা আওয়াজ করিলেন। ইহা শুনিয়া হাতী ফিরিল বটে কিন্তু আমাদের পথে নহে। হাতীর পথ অনুসরণ করিতে করিতে লোকেন্দ্র বাবুর গাছের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হওয়ামাত্র লোকেন্দ্র বাবু বলিলেন, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম আহত গুণ্ডা ও হস্তিনী সেই পর্য্যন্ত আসিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল—বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে।

হাতীর কপালে দুই জায়গায়, মদস্রাবের ছিদ্রের নিকট, কাণের পাশে এবং শিরদাঁড়ার নীচে, এই কয় স্থান হইতেই রক্তপাত হইতেছে। পূর্ব্বের ক্ষতস্থান মাটির প্রলেপে ঢাকা।

ইহার পর হাতীর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করিয়া সমস্ত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলাম। যেখানেই কাদামাটি পাইয়াছে ক্ষতস্থানে তাহা প্রলেপ করিয়াছে—এখানেও মনে হইল হস্তিনী সমানে হস্তীর পরিচর্য্যা করিতেছে। কত দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় হস্তী এইভাবে পার হইয়া চলিয়াছে তাহার অবধি নাই। কি শক্তিমান এই জন্তু। আমরা ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও অসম্ভব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তখনও আশা সম্পূর্ণ ছাড়ি নাই। বেলা ৪½ টা পর্য্যন্ত চলিয়া প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একস্থানে আসিয়া হাতীর সদ্য চিহ্ন পুনরায় পাইলাম—একটা জায়গায় কিছু পূর্ব্বেই শুইয়াছে এবং হাতী এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে উঠিবার সময় দাঁতের উপর ভর করিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে। এই স্থান হইতে অল্প দূর মাত্র গিয়াই হাতীর বাঁশ ভাঙ্গার শব্দ পাইলাম। বৃক্ষবহুল স্থানের শেষে একটা ৩।৪ হাত পরিমাণ নালা পার হইয়া হাতী একটা "চাতালে" (অর্থাৎ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে) ঘনসন্নিবিষ্ট নলবনে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা হাতীর পথে নালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতেই সুস্পষ্ট নিশ্বাসের শব্দ পাইলাম। পাশেই একটা ছোট গাছ ছিল। একজন পাঞ্জালীকে তাহার উপর হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলাম। লোকটা উঠিয়াই একটু পরেই সহসা নামিয়া আসিল। বলিল হাতী ১০।১২ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে। হস্তিনী আহত হস্তীকে আড়াল করিয়া আছে—আক্রমনোদ্যত হইয়া আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা গাছে উঠিয়াই দেখে হস্তিনী আহতের ক্ষত স্থানে শুঁড় বুলাইয়া মাটির প্রলেপ দিতেছে। কিন্তু আমাদের শব্দ পাইয়াই হউক অথবা গন্ধ পাইয়াই হউক সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাতীর নূতন ক্ষত স্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত তখনও হইতেছিল; কিন্তু পুরাতন ক্ষত স্থান হইতে তখনও কিছু রক্তই হউক অথবা জলীয় কোনও পদার্থই হউক মিলিত হইয়া প্রলেপের মাটি ভিজাইয়া দিয়াছিল।

এমন সমতল জায়গায় এত ঘনসন্নিবিষ্ট বনে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শিকার করিতে যাওয়া বিপদসঙ্কুল হইবে। আমরা পাঞ্জালী ভাল নহি—সুতরাং একজন পাঞ্জালীকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতেই হইবে। কিন্তু এই ধরণের বনে হাতীর সম্মুখীন এমন ভাবে হইতে হইবে যে শিকারী হাতী দেখিতে পাওয়ার পূর্ব্বেই পাঞ্জালী

হস্তী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। সুতরাং শিকারী সম্মুখে না থাকা অত্যন্ত অন্যায় ও বিপজ্জনক। নিরস্ত্র পাঞ্জালীকে এইভাবে বিপদের মুখে ফেলিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকা কাপুরুষতা। অথচ নিজের জ্ঞানের অল্পতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকায় মূঢ়ের মত বৃথা স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। ভুল পদচিহ্ন অনুসরণ করিলে শিকার নষ্ট ও অপমৃত্যু উভয়ই হইতে পারে। সুতরাং স্থির করিলাম পাঞ্জালীকে গাছের উপর উঠাইয়া হাতীর দিকে ঢিল ছুঁড়িতে বলিব। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া আক্রমণ করিতে আসাই হাতীর পক্ষে স্বাভাবিক, তখন গুলি করিব। কিন্তু হস্তিনীও আসিতে পারে সেইজন্য শট গানে 'এস জি' মার্কা ছররা ভরিয়া রাখিয়া অপর এক শিকারীর হাতে দিয়া বলিলাম, কুন্‌কী আক্রমণ করিতে আসিলে তাহার পায়ে গুলি করিতে হইবে। পুনরায় পাঞ্জালী গাছে চড়িয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, হাতী দুইটাই একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে—এখন আর দেখা যায় না। তখন দুইজন পাঞ্জালীকে উল্টা পথে যাইয়া ফাঁকা আওয়াজ করিয়া হাতীকে আমাদের পথে তাড়াইয়া দিতে বলিলাম, তাহা হইলে হাতী আমাদের দিকে অগ্রসর হইলে গুলি করার খুবই সুযোগ হইবে। পাঞ্জালীগণ চলিয়া গেলে একটা গাছের আড়ালে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটা গাছ ভাঙ্গার শব্দ হওয়ার পরই হস্তিনীর একটা ভীষণ ক্রোধান্ধ শঙ্খনাদ শুনিলাম। আর কিছুই শোনা যায় না। সব স্তব্ধ। স্থির হইয়া চাহিয়া আছি, হাতী আমাদের পথে আসে কিনা দেখিবার জন্য। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে—বনানী বিহগকূজন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, গাছের নীচের ছায়া দ্রুত ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় মনে হইল, বিরাট ভূতের মত কি যেন একটা ছায়া-মূর্ত্তি নিঃশব্দে গাছের নীচে প্রায় ২৫ গজ দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার মনে হইল যেন হাতী। ঠিক সাম্‌না সাম্‌নি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—নিশ্চল। দুইটা দাঁতও যেন স্পষ্টই মনে হইল, কিন্তু আবার মনে হইল বুঝি বা চোখের ধাঁধা;—গাছের ডালে আলো পড়ায় অমন দেখা যাইতেছে। চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ১০ গজ অগ্রসর হইয়া একটা উঁচু জায়গায় যেই দাঁড়াইয়া দেখিতে যাইব অমনি অতর্কিতে একটা শুক্‌না ডালের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মড়মড় শব্দ ও সব অদৃশ্য। ২৫।৩০ গজ দূরে দাঁড়াইয়াছিল হাতীটা, অথচ আমি এবং সঙ্গীদ্বয় কেহই টেরই পাইলাম না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জালীরা ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল, তাহারা যে দিকে গিয়াছিল হাতীও সেই দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ তাহারা

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র হস্তিনী তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সম্মুখে একটা গাছ থাকায় তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। হস্তিনী আসিয়াই গাছটা ভঙ্গিয়া ফেলে। ইত্যবসরে তাহারা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। হস্তিনী রাগে চীৎকার করিয়া কতকদূর দৌড়াইয়া আসে। বন্দুক ছুঁড়িবার অবসরও তাহারা পায় নাই।

ইহার পর সেই রাত্রিতে গারোপাহাড়ের নিবিড় বনে যে কি কষ্ট পাইয়াছি তাহা লিখিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না।

পাঞ্জালী এই হাতীকে আরও অনেকদিন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে—শেষ সংবাদ যাহা দিয়াছে তাহাতেও ইহাই বুঝিয়াছি যে হস্তিনী আঁহত সঙ্গীর সান্নিধ্য কখনও পরিত্যাগ করে নাই, মানুষের শব্দ শোনামাত্র পাগল হইয়া আক্রমণ করিয়াছে।

এই শিকার-স্মৃতি বহুদিন মনে জাগিবে—আর স্পষ্ট হইয়া জাগিবে হাতীর এই মায়ার বন্ধনের দৃষ্টান্ত।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

সভ্যতা *

ক্লাইভ বেল

উপক্রমণিকা

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তিবর্গ সভ্যতার জন্যই যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, তখন সভ্যতা যে ঠিক কি বস্তু তাহার অনুসন্ধান করা আশা করি ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। 'স্বাধীনতা' এবং 'ন্যায়' এই দুইটী শব্দ চিরকালই ব্যয়সঙ্কুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কিন্তু 'সভ্যতার' জন্যও যে—আমার ঠিক স্মরণ নাই—দৈনিক কত কোটী মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়, বহু চিন্তাশীল করদাতা ইহাতে বিস্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সমরাদর্শের তালিকায় এই শব্দটীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারের কাহিনী এতই বিস্ময়কর যে এত প্রাসঙ্গিক না হইলেও সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে আমি প্রলুব্ধ হইতাম। সেই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই আমাকে বুঝাইতে হইবে এই নিবন্ধ কেমন করিয়া রূপ-পরিগ্রহ করিল।

যাঁহারা আমাদের যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞতম, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "তোমরা সভ্যতার জন্য যুদ্ধ করিতেছ।" সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সে আহ্বানে কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিল, "সভ্যতার দোহাই, এস যোগ দাও।" এ পর্য্যন্ত রাজনীতিজ্ঞ বা সেনাগঠনে নিযুক্ত সার্জ্জেণ্ট বিশুদ্ধ চিন্তায় কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের এই আকস্মিক উৎসাহে বিচলিত হইয়া আমিও প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, "ভাল, কিন্তু সভ্যতা কাহাকে বলে?" সশব্দে ঘোষণা করি নাই, না বলিলেও চলে; কারণ সে সময় ঐরূপ বিষয় লইয়া চীৎকার করিলে জেলে যাইতে হইত। কিন্তু এখন এরূপ প্রশ্ন অন্যায় বা দেশদ্রোহিতা বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং যাহার জন্য আমরা যুদ্ধ করিয়াছি এবং এখনও যাহার জন্য আমাদের অর্থব্যয় হইতেছে, সেটি কি বস্তু, আমি জানিতে চাই। যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্যের স্বরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত

* শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল কর্তৃক অনূদিত।

হইতেছি। এই অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হইবে কি না, এবং হইলেও আবিষ্কৃত সত্যের সহিত ভের্সাইয়ের সন্ধির কোনও সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে কি না, ভবিষ্যতের জন্য, সে বিচার মুলতুবী রহিল।

আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, ইংলণ্ড যুদ্ধে যোগদান করে জার্ম্মানী একটা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করে বলিয়া। বলা হয়, অন্যায়ের সমর্থন অপেক্ষা ইউরোপব্যাপী মহাসমরও বরণীয়। "Fiat justitia, ruat cælum",—ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক, যদিও তাহাতে গৃহ ভূমিসাৎ হয়! এই ভীতিপ্রদ নীতির অকুণ্ঠিত গ্রহণে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে হয়ত সংশয় উদ্রিক্ত হইয়াছিল। যে সব লেখক এবং নেতা ইংলণ্ডের চ্যাপেল-বিহারী জনসমাজ ও উদারনৈতিক সংবাদ-পত্রের পাঠকদের কাছে যুদ্ধ ঘোষণাকে সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহারা হয়ত এই সংশয়ের বশেই যুদ্ধের লক্ষ্য ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত সপ্রমাণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ যাহাই হউক, ব্যাপার দাঁড়াইয়াছিল ঠিক ইহাই। কে যেন, স্বয়ং লয়েড জর্জ্জও হইতে পারেন কিম্বা হয়ত হোরেশিও বটমলি মহাশয়, কল্পনায় ক্রুশের সহিত ক্রুপ্‌সের বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। যুদ্ধের সূচনা হইতেই সংবাদ-পত্রসমূহ যুদ্ধকে আরমাগেডন রূপে গ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং যুক্তির খাতিরে কাইজার দ্বিতীয় হ্বিলহেল্‌ম হইলেন অ্যাণ্টি-ক্রাইস্‌ট। তাঁহার চরিত্রে নীরোর চরিত্রের সুস্পষ্ট আভাষ ছিল, সম্ভবতঃ কাইজারে আরোপিত সঙ্গীতপ্রীতি উহার লক্ষণ। তা ছাড়া, কত ভবিষ্যদ্বাণী, ইঙ্গিত, আকাশে কত ভবিষ্যতের সূচনা, মন্‌সে দেবদূতের মেলা। সব মিলিয়া প্রমাণ করিল ভগবান আমাদের সহায়, এবং খুব সম্ভবতঃ আমাদের বিরোধ সয়তানের সঙ্গে। তবুও জার্ম্মান সম্রাটের চিত্তাকর্ষক আচরণের কথা স্মরণ করিয়া কাহারও কাহারও পক্ষে কাইজার ও অ্যাণ্টিক্রাইস্‌টের অভিন্নতা বিশ্বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিল। তরুণীদের হাতে 'যীশুর সহিত কথোপকথন' নামক একটী পুস্তিকা নাকি তিনি গুঁজিয়া দেন। ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা কি শোভন? ফরাসী রাষ্ট্রতন্ত্র না প্রকাশ্যেই সংশয়বাদী; এবং মিকাডো না শিন্‌তো উপাসক? আর খৃষ্টানদের ভগবানকে এ হেন বিবাদে জড়াইয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ এ যুদ্ধে ক্যাথলিক ধর্ম্মের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ অষ্ট্রিয়ার বিগত সম্রাটের বিপক্ষে যূথবদ্ধ হইয়াছিল অবিশ্বাসী ফরাসী, কদাচারী জাপানী, ভারতবর্ষ হইতে সমাগত মুসলমান ও পার্শী; সেনেগালের নরাশী। অতএব, যখন আমরা এই যুদ্ধকে ঠিক ধর্ম্মযুদ্ধ বলা যায় কি না ভাবিয়া বিপন্ন হইলাম, এ হেন সময় হুঁশিয়ার এবং কৃতবিদ্য কোনও ভদ্রলোক, সম্ভবত "টাইম্‌স্ লিটারারি

সাপ্লিমেণ্টে"র কোনও লেখক,—আবিষ্কার করিলেন, মিত্রশক্তি যাহার বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা আসলে নিচে (Nietzsche)।

এ আবিষ্কারে প্রথমে বেশ কাজ চলিল। আমাদের প্রত্যেকের মনের উৎকট তেজস্বিতার লক্ষ্য হইয়া উঠিলেন নিচে। নিচে জার্ম্মান, তদুপরি তিনি কবি; শাসক সম্প্রদায়ের নিকট ইহাই যথেষ্ট অপরাধ। এবং যেহেতু শোনা গেল তিনি নাকি সাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন, তখন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরও তাঁহাকে ভাল না লাগার কারণ পাওয়া গেল। নিপাত যাক নিচে! হাঁ, মজা বটে, সেই জঘন্য পাষণ্ডকে বেশ কসিয়া উত্তম মধ্যম দেওয়া, লিবরল-ইউনিয়নিষ্টদের সঙ্গে সায় না দিয়াও লিবরলদের উপহাস করিবার যাহার দুঃসহ স্পর্দ্ধা। নিচে মৃগীরোগগ্রস্ত; তাহার নাকি গলগণ্ড ছিল; মোটের উপর একেবারেই অভদ্র। তাহার কথা শ্রমিকদের বলা হইল; বলা হইল, নিচে জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদের ঋষি, প্রুশিয়ার কবি, যুঙ্কারদের স্তাবক। জার্ম্মান সাহিত্য নাড়াচাড়া করিয়া নিজেকে বিপন্ন করিয়াছে এমন কোনও দেশদ্রোহী যদি আমাদের পাণ্ডিত্যে সংশয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমরা আটক রাখিয়াছি। ১৯১৪ সালের সেই সব সেরা দিনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিচের কবল হইতে প্যারিসকে রক্ষা করিতেছিল এবং নিচের পিছনে উদ্যত হইয়াছিল রুশিয়ার ষ্টীমরোলার।

তথাপি নিচের বিরুদ্ধে এই আত্মরক্ষা সকলের সর্ব্বাংশে মনঃপূত হয় নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার ভাব কেমন যেন গ্লানিকর। দ্বিতীয়তঃ নিচে নামটি উচ্চারণ করাও কত দুরূহ; তা ছাড়া দশ হাজারে একজনও যাহার অস্তিত্বের কথাও ছয়মাস পূর্ব্বে জানিত না, তাহার জন্য যুদ্ধ করা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকিল। কোনও কিছুর বিরুদ্ধেমাত্র যুদ্ধ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হইল না; আমরা চাহিলাম এমন কিছু, যাহার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি। কিসের জন্য? বেলজিয়ম অত্যন্ত তুচ্ছ, হেয় নাই বলিলাম। খৃষ্টধর্ম্ম বলা নির্বুদ্ধিতা। শক্তির ভারসাম্য অতি সেকেলে কথা। আমরা নিজেরা? তা কি সম্ভব? আমরা চাহিলাম এমন একটী বস্তু, যাহার নাম গালভরা, যাহা মনকে উন্নত করে, অথচ যাহার সহিত সকলে পরিচিত। এমন একটী বস্তু যাহার জন্য অন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে ভাবিয়া সকলেরই গর্ব্ব এবং আনন্দ হয়, হোক সে খৃষ্টান, হোক সে সংশয়বিলাসী; হোক না সে উদারনৈতিক, বা রক্ষণশীল বা সমাজতান্ত্রিক; হোক তারা যুদ্ধের ভক্ত বা যুদ্ধবিরোধী; মারী কোরেলির মুগ্ধ অনুরাগী বা ওয়েল্‌সের বেশী ভক্ত; হুইস্‌কিতে অনুরক্ত, বা লেডি অ্যাসটরে আস্থাবান। অর্থাৎ এক কথায় 'ডেলি

নিউজ' বা 'ডেলি এক্‌স্‌প্রেস' যে-কোন সংবাদপত্র হইতেই যে-কেহ মত আহরণ করুক, সকলেরই অনুমোদিত একটি বস্তুর জন্য আমরা উন্মুখ হইয়া উঠিলাম। এহেন সময়ে এমন যিনি ইতিহাসের ধারা এবং আত্মপ্রাধান্য একই সঙ্গে উপভোগ করিতে সক্ষম—হয়ত তিনি প্রধান মন্ত্রী, নয় অধ্যাপক গিলবার্ট মারে,—তাঁহার মনে এই সূক্ষ্ম ও চরম সত্য উদ্ভাসিত হইল যে আমরা যাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, তাহা 'সভ্যতা'। আমার মনেও এই জরুরী প্রশ্নের উদয় হইল, "কি এই সভ্যতা, যাহার জন্য আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত?"

এমন আশা নাই যে ঠিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারিব। যে অপূর্ব্ব নিশ্চয়তার বলে ষাট হাজার কথায় আর্ট ঠিক কি বস্তু পৃথিবীকে একদিন জানাইয়াছিলাম, সে দৃঢ়তা কাটাইয়া উঠিয়াছি। তবুও ব্রিটিশ সেনাপতি যেমন ফ্রান্সের মানচিত্রে বেতের মাথা ঠুকিয়া রুক্ষভাবে বলিতে পারিতেন, "তোমাদের গন্তব্যস্থান এই রকম কোনও জায়গায়", আমিও তেমনি সাধারণ-জ্ঞানের মানচিত্রে খানিকটা কালি মাখাইয়া বলিতে পারি, "এই রকম কোনও স্থানে সভ্যতার অবস্থিতি।"

কথাটা নীরস ও সুস্পষ্ট হইলেও মনে করা খুব যুক্তিযুক্ত যে 'সভ্যতা' জিনিষটা ভাল। যদি তাহা না হইত 'সভ্যতার' জন্য আমরা এত ব্যয় করিতে পারি কেহ প্রত্যাশা করিত না। যদি ভালই হয়, উহা লক্ষ্য না লক্ষ্যসাধনের উপায়? যখন আমরা 'অতি সুসভ্য' সমাজের কথা বলি, তখন সভ্যতা শব্দটীতে যদি আদর্শ বা চরম পরিণতি বা স্বর্গ না বুঝি, তাহা হইলে 'সভ্যতা' লক্ষ্যবাচন করে না। সভ্যতার ত্রুটি বা সভ্যতার গ্লানি সম্বন্ধে যখন আমরা প্রায়শই আলোচনা করিয়া থাকি, তখন দেখা যায় আমাদের প্রায় সকলের কাছেই 'সভ্যতা' শব্দটী উপায় মাত্রই নির্দ্দেশ করে। স্বর্গের ধারণা সভ্যতাকে অতিক্রম করে; এবং শ্রেষ্ঠ সভ্যতার অধিকারী হইলেও কোনও সমাজ আদর্শের গৌরব নাও লাভ করিতে পারে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, আমি যাহার বর্ণনা করিতে সচেষ্ট, তাহা চরম সত্য নয়, সত্য নির্দ্ধারণের বিশেষ পন্থা মাত্র। ইহার মূল্য-বিচার পরে করিব। আপাততঃ এইটুকু মানিলেই চলিবে যে সভ্যতা যখন ভাল এবং মনের উন্নত অবস্থা যখন একমাত্র শিব বলিয়া সাধারণত পরিগণিত, তখন সভ্যতা উন্নত মানসিক বৃত্তির সহায়ক। অতএব উল্লাসের বিষয় এই যে যাহারা সভ্যতার জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারাই যুদ্ধে জয়লাভ করিল।

সভ্যতা কল্যাণের একটি পথ বলিলে ইহাই একমাত্র পথ, এমন কথা বুঝায় না। এই কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, কারণ সম্প্রতি একটী মতবাদের

উদ্ভব হইয়াছে; এই মতে ইঙ্গলাভের কোনও পথ যদি একমাত্র পথ না হয়, তাহা হইলে সে পথই নয়। এইরূপ দার্শনিকদের নিকট—ইঁহাদিগকে লেখক বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়—বিজ্ঞান অবজ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে শুধু এই জন্য যে ইহাদের এবং অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে পৃথিবীতে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই তাহা সৌন্দর্য্য এবং উৎসাহের অভাবে বৈভবহীন হইয়া পড়িবে। উৎসাহ এবং শ্রী এবং জ্ঞান, সবগুলিই কল্যাণের পথ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিতে এদেশে এবং বিদেশে 'নব-মাখো-জাখো' রোমান্টিক মনে কেন যে এত আপত্তি বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই সভ্যতাই উৎকর্ষের এক মাত্র সরণি নয়। যে কোনও মানসিক অবস্থার পক্ষে জীবন অপরিহার্য্য, সুতরাং জীবনও উৎকর্ষের পন্থা। সূর্য্যের আলোক এবং বৃষ্টি জীবনধারণের সহায়ক; অতএব ইহারাও কল্যাণের উপায়। নিঃসংশয়ে বলা যায় জীবন এবং সূর্য্যালোক এবং বৃষ্টি সকলই সভ্যতার মূলে, কারণ ইহাদের পরিহার করিয়া সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু তবুও ইহারাই সভ্যতা নহে, এবং সভ্যতার আশ্রয় বলিয়াই ইহারা উৎকর্ষের পথ, এমন কথাও বলা যায় না। বস্তুতঃ জীবন, সূর্য্য, বৃষ্টি, খাদ্য, পানীয়, সৌন্দর্য্য, বিজ্ঞান, সভ্যতা সবগুলিই কল্যাণের পথ; শুধু মনে রাখিতে হইবে সৌন্দর্য্য কল্যাণের প্রত্যক্ষ উপায়, সভ্যতা পরোক্ষ; আলোক, বারিপাত, এবং জীবন অপরিহার্য্য হইলেও আরও পরোক্ষ।

এই প্রসঙ্গে কালি ও কাগজ নষ্ট করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিত না, যদি না স্পষ্টই দেখিতাম এই সিদ্ধান্ত হইতে আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বস্তুতঃ দুটি সিদ্ধান্তই মূলতঃ এক। কিন্তু যাঁহারা প্রথমটী প্রত্যক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দ্বিতীয়টির কথা অনেক সময়ে ভাবেন না, বিশেষতঃ যখন তাঁহারা সভ্যতার দোহাই দিয়া 'এটা কর' 'ওটা কর' বলেন। সিদ্ধান্তটী এই, সভ্যতা যখন উৎকর্ষের একমাত্র পথ নয়, তখন ইষ্টসাধনের যে কোনও পথকেই সভ্যতা বলা যায় না। অবশ্য যদি সভ্যতাই মঙ্গলের একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে যাহা কিছু মঙ্গলের পরিপোষক তাহাকেই সভ্যতার অঙ্গ বলা যাইত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন ঠিক করিয়া বাছাই করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত। ঠিক লোকের হাতে এবং ঠিক সময়ে 'জিন ও বাইবেল' নিশ্চয়ই কল্যাণের উপায় হইতে পারে; তবুও ইউরোপের বণিকসম্প্রদায় এবং ধর্ম্ম প্রচারকগণ অসভ্য সমাজে যাহা আমদানী করেন তাহাকে সভ্যতা বলা কতখানি সঙ্গত, এ প্রশ্নও স্বাভাবিক। অযৌক্তিক এবং ধ্রুব বিশ্বাস, অন্ধ দেশভক্তি এবং ব্যক্তিগত অনুরাগ বহুক্ষেত্রে মনের তুরীয় অবস্থা আনয়নে সহায় হইয়াছে; অতএব উৎকর্ষের পথ হইয়াছে;

কিন্তু তথাপি এগুলি সভ্যতা নয়, বরঞ্চ সভ্যতার প্রতিপন্থী। সভ্যতা উৎকর্ষ লাভের বিশেষ একটি উপায়; তাই বলিয়া আমরা যেন ধরিয়া না লই যে যাহা কিছু আমাদের প্রিয় বা যাহা কিছু শ্রদ্ধার পাত্র, তাহাই সভ্যতার অঙ্গ। আমাদের ইহা মানিলে কিছুতেই চলিবে না যে আমাদের প্রিয় গুণাবলীই সভ্যতার বক্ষে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা অপেক্ষা এক টুকরা মাটন রোষ্ট আমাদের কাছে অনেক ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু শুধু ভাল লাগার খাতিরে এই দুইটী চমৎকার কাজের মধ্যে ভোজন ক্রিয়াটিকেই সভ্যতর মনে করা একটু দুঃসাহসের পরিচায়ক হইবে। সভ্যতা উৎকর্ষের একমাত্র পথ নয়, যে কোনও পথও নয়, বিশেষ একটি পথ। এই পথ মিত্রশক্তির রাষ্ট্রধুরন্ধরদের মতে ছাড়া আমার মতেও আরও প্রবল কারণে বিশেষ মনোযোগের অধিকারী। এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও এই পথের সন্ধান বহুদূরে।

যাঁহারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ এই প্রকার আলোচনায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের জানিবার সুবিধা ঘটিয়াছে যে 'সিভিলাইজ্‌ড' এই পদটি (ল্যাটিন বিশেষণ সিভিলিস) সাধারণতঃ রাষ্ট্র বা সমাজ (সিভিটাস) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং এ প্রয়োগ শিষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফরাসীতে 'সিভিলিজে' পদটার প্রতিশব্দরূপে 'পলিসে' ব্যবহৃত হইত; এবং সবাই জানে গ্রীক 'পলিস' শব্দটার অর্থ জনপদ। যখন সভ্য যুগের কথা বলি, তখন ঐ যুগে সমাজটী সভ্যতালাভ করিয়াছিল, ইহাই বুঝি। 'সভ্যতা' এই শব্দটী ব্যাপকতরভাবে মণ্ডলীবদ্ধ জনসমূহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত যে হইয়া থাকে, সে প্রয়োগও সাধু। এই শব্দটী সঙ্কীর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে পৌরজন সম্বন্ধে। সে যাহাই হউক, ল্যাটিন জিরাও বা মি-ভাগান্ত গ্রীক ক্রিয়াপদের রূপ-নিরূপণের শানে যাঁহাদের মন পালিশ হয় নাই, তাঁহারাও সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে সভ্যতা বস্তুটী সভ্য মানবেরই কীর্ত্তি; এবং ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে বা ইহার উৎপত্তি বুঝিতে হইলে অপরিহার্য্য কারণেই প্রত্যক্ষরূপে আলোচনা করিতে হইবে সেইসব মানব সম্বন্ধে যাহারা সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সভ্যতা সংরক্ষণ করিতেছে। পরন্তু, স্থূল বুদ্ধিতেই দেখা যায়, রাষ্ট্র বা সমাজের ন্যায় কোনও অনিশ্চিত এবং বহুমুখী সত্তা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ব্যক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সমধিক সম্ভাব্য এবং উপযোগী। মানুষের মনের খোঁজ তবুও পাওয়া যায়; জন স্মিথ বা বাই সিঙ্গের আকাঙ্ক্ষা বা মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অন্তত কিছু জোর করিয়া বলা যায়; কিন্তু গ্রেটব্রিটেন বা চীনের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কি-ই বা বলা যাইতে পারে? যখন আমরা চীনের মর্য্যাদা

বা ইংলণ্ডের স্বার্থের কথা বলি, তখন সুনিশ্চিত কিছু ভাবিতেই পারি না, সম্ভবতঃ কিছুই ভাবি না। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সকল অধিবাসীরই স্বার্থ এক নয়, যেমন সব চৈনিকের মনোবৃত্তি এক নয়। কিন্তু একজন বিশেষ চীনার প্রবল আসক্তি কি তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি, যেমন কোন একটী কাজ স্মিথের মনঃপূত হইবে ভরসা করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা সবাই জানি, ইংলণ্ড যদি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিত তাহা হইলে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না; কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি স্মিথ পরম নির্ভয়ে উদাসিকই থাকিত।

অতএব, সভ্য মানব কি উপাদানে ঘটিত তাহাই নির্দ্ধারিত করিয়া আমি সভ্যতার স্বরূপ অনুসন্ধানের সূত্রপাত করিব এরূপ ভাবা স্বাভাবিক। যুক্তির দিক হইতে এই পারম্পর্য্যই সঙ্গত; কিন্তু এই পন্থা অনুসরণ করিবার পথে অন্তরায় আছে। সে অন্তরায় এই যে, কোন বিশেষ সমাজ সভ্যতা, এমন কি বিশিষ্ট সভ্যতা, অর্জ্জন করিয়াছে ইহা সর্ব্বসম্মত হইলেও ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ মতৈক্য নাই। আমার উদ্দেশ্য যখন সভ্যতার রহস্য উদ্ঘাটন তখন যাহা সভ্য বলিয়া স্বীকৃত, প্রথমতঃ তাহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হওয়াই উচিত। সুতরাং যদি আমি 'সভ্য মানব' এই সত্তাটী বিচার করিবার পূর্ব্বে 'সভ্য সমাজ' সত্তাটীর বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহার কারণ এই হইত যে 'সভ্য সমাজের' কতকগুলি বিভিন্ন রূপ আছে যাহা সকলের দ্বারা স্বীকৃত।

এ দুইটির কোনটির আলোচনাই কিন্তু আপাততঃ করিব না। আলোচনা আরম্ভ করিব এমন কয়েকটি সত্তা লইয়া যাহা সকলে বর্ব্বরতা বলিয়া স্বীকার করে, কারণ এইগুলির বৈশিষ্ট্যের সঠিক বিশ্লেষণ করিলে এমন কতকগুলি নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, যেগুলির মূল্য চরম। জানিতে পারিব সভ্যতা কি নয়। যাহা বর্ব্বর সমাজের লক্ষণ, তাহা সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না। বর্ব্বর সমাজের কোনও লক্ষণ সভ্য সমাজের লক্ষণ হইতে পারে না। যতক্ষণ সভ্যতা কি নয় জানিতে না পারি, ততক্ষণ সভ্যতার মূল তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব না,—যে মূল তত্ত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে সর্ব্বজনস্বীকৃত সভ্যতার প্রতীকে। সেই সব প্রতীকগুলির মধ্যে যখন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাইব—যদি দেখা সম্ভবই হয়,—তখন আমার কার্য্যের প্রথম অংশ সম্পন্ন হইবে। সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন বলিতে পারিব।

আমি একটি তত্ত্বের বিশদ আলোচনায় নিযুক্ত। আমার পাঠকদের

অনুমোদন লাভ করিতে হইলে, সেই তত্ত্বকে খাড়া করিতে হইবে এমন কতকগুলি অনুমানের উপর যাহা তাঁহাদের মতে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। অর্থাৎ সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি আমাকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে এমন কয়েকটি সত্তার বিচারপ্রসঙ্গে, যে সব সত্তা সকলেই সভ্যতা বা বর্ব্বরতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র সমাজের সভ্যতা বা বর্ব্বরতা সম্বন্ধেই সকলে একমত; কাজেই ব্যক্তির বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া সমাজের মধ্যেই আমাদের সভ্যতার লক্ষণগুলি খুঁজিতে হইবে। এগুলির সন্ধান মিলিলে আমরা ইহাদের উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব; এবং সে উৎস থাকিতে পারে একমাত্র নরনারীর হৃদয়ে। আমরা দেখিতে পাইব ইহাদের কতকগুলি সভ্যতার মূল ধারার প্রবাহ জোগাইতেছে। এই জিজ্ঞাসাসূত্রে যদি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সভ্যতার কারণ অনুসন্ধানের ফলে আমরা সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিতে পারি কি না, স্বভাবতঃই আর একটী প্রশ্নের সঞ্চার হইবে,—কি উপায় অবলম্বন করিলে সমুন্নততর সভ্যতার অধিকারী এবং সংরক্ষক নরনারীর অভ্যুদয় সম্ভব। কিন্তু আপাততঃ সমাজের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে সভ্যতার লক্ষণ; কারণ সমাজেই এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যাহাকে সকলেই বর্ব্বরতা বা সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করে। অন্ততঃ দুই তিনটী এমন সমাজ আছে যাহাদের সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সুশিক্ষিত লোকদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নাই। এই সভ্যতাগুলিকে আমরা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিব; আর তিন চারিটী সভ্যতা, যাহাদের প্রায়ই সুসভ্য বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাদের আলোচনা হইতে বিরত থাকিব।

কতকগুলি সমাজকে যেমন সকলেই সভ্য বলিয়া স্বীকার করে, তেমনি আর কতকগুলি সমাজ সকলের কাছেই বর্ব্বর বলিয়া পরিগণিত। এই সমাজগুলি আমাদের প্রশংসার পাত্র হইতে পারে; সভ্য সমাজ অপেক্ষাও এগুলি আমাদের কাছে প্রিয় হইতে পারে; অন্ততঃ আমরা মনে করিতে পারি, এগুলি আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এই সব সমাজের বর্ব্বরতা সম্বন্ধে এরূপ মতৈক্য আছে যে মানবজাতি যে সমস্ত শতাব্দী বা বর্ষসহস্রক্রমের প্রবাহের মধ্য দিয়া প্রস্তরজীবন অতিক্রম করিয়া প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে নব প্রস্তরযুগের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই কালের আদিম মানবজীবনের অস্তিত্বের কোনও লক্ষণ সন্ধান করিতে হইলেই নৃতত্ত্ববিদেরা এইসব সমাজের জীবনযাত্রা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এইসব বরণীয় নৃতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জাতিসমূহের মধ্যে অনুন্নততম জাতিগুলির আচার ও বিশ্বাসের সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। ইঁহাদের

আলোচনা হইতে আশা করি জানিতে পারিব সভ্যতা কি নয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, বর্ব্বর সমাজের কোনও লক্ষণই, সে লক্ষণ যত শ্রদ্ধেয়ই হোক না কেন, সভ্য সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতে পারে না। সভ্য সমাজে এইসব গুণ অবশ্যই থাকিতে পারে। এরূপ লক্ষণ সর্ব্বমানবের সাধারণ বৃত্তি হইতে পারে, কিম্বা বর্ব্বরতার ধ্বংসশেষ রূপেও ইহারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। পরন্তু এই বিশিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক প্রতীকগুলি বর্ব্বর সমাজের বিশেষ সামগ্রী হওয়া দূরে থাক, অধিকাংশ সভ্য সমাজেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ বৈশিষ্ট্য যতক্ষণ সভ্য সমাজ মাত্রেরই একান্ত নিজস্ব সম্পদ না হয়, ততক্ষণ কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞানির্দ্ধারণের সহায় হইতে পারে না। কতকগুলি মানসিক বৃত্তি বর্ব্বর ও সভ্য সমাজে একই সঙ্গে অবস্থান করিলেও এরূপ বৃত্তিকে কোনও সমাজেরই বিশিষ্ট লক্ষণ বলা যায় না। আমাদের লক্ষ্যই বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্ধারণ। এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে আমরা ব্যাপৃত, যাহা সমস্ত সভ্য সমাজেই আছে, অথচ বর্ব্বর সমাজে নাই। এই দুই সূত্রের জট খুলিতে পারিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, সভ্যতা কাহাকে বলে।

সুতরাং আমার প্রথম কাজ হইল জঙ্গল সাফ করা। নিম্নতম এবং অনুন্নততম বর্ব্বর সমাজেও দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া যে সব বৈশিষ্ট্যকে আমরা সভ্যতার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে পারিব না, সেগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি একটী অধ্যায় রচনা করিব। যে সব পাঠক সঙ্গত কারণে আমার পাণ্ডিত্যে সন্দিহান, তাঁহারা এই পৃষ্ঠাগুলির পাদদেশে হয়ত টীকার অরণ্য অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। এরূপ তুচ্ছ ও হালকা প্রবন্ধে বিস্তৃত পাদটীকার স্থান নাই। কয়েকটী টীকা থাকিবে বটে, কিন্তু নেহাতই কয়েকটী। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নিবদ্ধ তথ্যের জন্য আমি ওয়েষ্টার-মার্কের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দি মরাল আইডিয়াজের" সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি যতগুলি তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছি প্রত্যেকটির প্রমাণ সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক এই পুস্তকে পাইবেন। উপরন্তু তাঁহারা পাইবেন অসভ্য জাতিসমূহের ধর্ম্মবিশ্বাস ও নীতিবোধের বিশদ বিবরণ। এই বিবরণ বিপুল পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, অসংখ্য টীকায় অলঙ্কৃত, ও মনোগ্রাহী দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট। তরল সাহিত্যে পাদটীকা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি এই যে, প্রথমতঃ পাদটীকা আমাদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে; এবং বহু ক্ষেত্রেই উহা দুরূহ বিষয়কে রূপবদ্ধ করিবার কষ্টসাধ্য আয়াসকে এড়াইয়া যাইবার কৌশলমাত্র। সংবাদপত্র-সেবার দ্বারা অমরত্ব লাভের অপরিহার্য্য অস্ত্র এই পাদটীকা। কিন্তু

যাহার প্রথম শব্দ হইতে শেষ শব্দ পর্য্যন্ত সমগ্রভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে এমন রসরচনায় পাদটীকার ব্যবহার দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা অপছন্দ করি, এমন নয়। বরঞ্চ বিচক্ষণ উদ্ধৃতি এবং গালভরা নাম মুদ্রিত পৃষ্ঠার কতখানি গৌরববর্দ্ধন করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি অন্যের মতই সচেতন; এ ছাড়া যাঁহারা আমার মতের অনুগামী হইবেন এই পুস্তকে কয়েকটি চমৎকার উদ্ধৃতি ও নাম দেখিয়া তাঁহারা সান্ত্বনা ও আশ্বাস দুইই পাইবেন। কিন্তু * তারকা-চিহ্ন ব্যবহার করিব শুধু তখনই যখন আমাকে এমন কিছু বলিতে হইবে যাহার সম্বন্ধে বৈরভাবাপন্ন পাঠকের মুখ হইতে ঝাঁ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে—'মিথ্যুক'! তাহা হইলেই পাঠকের অপমানসূচক মন্তব্য আসল লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিবে।

এই ধরণের পাঠকের তুষ্টিবিধানের জন্য আমি আমার প্রবন্ধ হাল্‌কা ও খেলো বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। এ রচনা সব রকমেই নেহাত খেলো সন্দেহ নাই; এবং সম্ভবতঃ ভাসাভাসাও হইবে। কিন্তু যখন হাল্‌কা কথাটী ব্যবহার করি, তখন শব্দটীর আধুনিকতম অর্থের কথাই ভাবিতেছিলাম। বলিতে চাহিয়াছিলাম, নিজেকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিব। যে সমস্ত লেখক অভাবের তাড়নায় বা যুদ্ধের খাতিরে শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে এবং সহজেই বুঝিতে পারি তাঁহারা কেন সেইসব লেখকদের পাত্তা দিতে চান না যাঁহাদের উদ্দেশ্য সহজে, সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় নিজেদের চিন্তা প্রকাশ করা। এই সর্ব্বনাশী উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের চিন্তাবীরদের দীর্ঘায়তন গ্রন্থসম্ভার শীর্ণ হইয়া কয়েক পৃষ্ঠায় মাত্র আসিয়া ঠেকিত; কারণ রুটীতে মাখাইবার মাখন মোটেই না থাকিলে পাতলা করিয়াও মাখান যায় না। এইরূপ অভাবের সময় এক মাত্র যাহা করা যায়, তাহা হইতেছে রুটির মধ্যে গভীরভাবে গুঁটিয়া দেখা; এবং সাহিত্যে ইহাকেই বলে গভীরতা। তবে এমন পাঠকও আছে যাহারা রুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একেবারে তলায় পৌঁছাইয়াও দেখিয়াছে সেখানেও এতটুকু 'মার্জারিনে'র গন্ধ নাই; কাজেই তাহারা এই গভীরতাকে ফাঁপা বলিতেও ভরসা পায়। তা সত্ত্বেও ইউরোপ ও আমেরিকার বুদ্ধি-তৎপর অঞ্চলে এখনও গভীর-ভাবদ্যোতক রচনারীতি সম্মানলাভ করিয়া থাকে। আমার পক্ষে কিন্তু বিবরবিহারী ছুছুন্দর বা কয়লার খাদের শ্রমিকের ভাব দেখান নেহাতই ভণ্ডামি হইবে। তা ছাড়া আধুনিক কবিতা, দর্শন এবং দার্শনিক উপন্যাস যে জনসাধারণের মনোহরণ করে, উহারা জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকায় অর্থ এবং অর্থহীনতার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলচেরা পার্থক্যকে

উড়াইয়া দেয়; বর্ত্তমান নিবন্ধ তাহাদের ভাল লাগিবে, এমন আশা করি না। আমার এত সাহস নাই যে প্রগাঢ় গভীরতা দাবী করিতে পারি। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, এই প্রবন্ধ মঁতেসকিও, হিউম বা ভলতেয়ারের অগভীর স্বচ্ছতার অনুকরণ নিশ্চয়ই করিত যদি প্রবন্ধকার জানিতেন কেমন করিয়া সেই স্বচ্ছতার রহস্য আয়ত্ত করা যায়।

বুঝাইতে চাই বলিয়াই বোধগম্য হইতে চেষ্টা করিব। সেই কারণেই পুনরাবৃত্তি করিব। অনেক দিন পূর্ব্বেই বিশালায়তন বিজ্ঞাপন হইতে আমার শেখা উচিত ছিল যে ক্রমাগত একই কথা বার বার বলাই লোককে বুঝাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু যখন ছোট ছিলাম তখন মানুষ সম্বন্ধে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন ছিলাম বলিয়াই ভাবিতাম, একবার স্পষ্ট করিয়া কোনও কথা বলিতে পারিলেই তাহার অর্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রকাশক চ্যাটো এণ্ড উইন্‌ডাসের কার্য্যালয়ে এক ভদ্রলোক ছিলেন আমার মতনই কাঁচা। তিনি আমার প্রথম পুস্তক 'আর্টের' পাণ্ডুলিপি পড়িয়া অতি সন্তর্পণে ইঙ্গিত করেন যে এক বিষয়ে—আর্টের সংজ্ঞা সম্পর্কে—আমি বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছি। বাড়াবাড়ি সত্যই করিয়াছিলাম। প্রকাশকদের এই 'পাঠক' ভদ্রলোক অসাধারণ ব্যক্তিরূপে ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকাশকরূপে তাঁহার কথা আদৌ ঠিক হয় নাই। সাধারণের পক্ষে আমি যথেষ্ট চর্ব্বিতচর্ব্বণ করি নাই; আজও ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সুযোগ্য সমালোচক অভিযোগ করেন আর্টের নিদর্শন বলিতে আমি ঠিক সেই জিনিষই বুঝি যাহা আমি বার বার বলিয়াছি আমি বুঝি না। যাহা হউক আমার শিক্ষা হইয়াছে এবং তাহারই জন্য নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ লক্ষ্য করেন এই নিবন্ধে আমি এক কথা বহুবার বলিয়াছি, তিনি যেন দয়া করিয়া স্মরণ রাখেন লেখকের একঘেয়েমির জন্য দায়ী পাঠকসম্প্রদায়ের একটী মানসিক বৈশিষ্ট্য—অবশ্য বলাই বাহুল্য যে পাঠক বা পাঠিকা এই কথাগুলি পড়িতেছেন তাঁহারা এই বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত।

(ক্রমশঃ)

"বাংলার আধুনিক পলিটিক্‌সের নিষ্ফলতা"

গোপাল হালদার

"বাংলা দেশের আধুনিক পলিটিক্‌সের নিষ্ফলতা" রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্‌সের পথিক নহেন। কিন্তু পলিটিক্‌সের ধার না ধারিলেও পলিটিক্‌স্ তাঁহাকে ছাড়ে না। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তও উহার পলিটিক্যাল পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া আর একটি কথাও আছে—বাঙালীমাত্রেরই দৃষ্টি পলিটিক্‌সে, রবীন্দ্রনাথও বাঙালীই; তাই বাংলার আধুনিক পলিটিক্‌স্ একদিক হইতে আধুনিক বাঙালী জীবনের এক সুস্পষ্ট প্রতিলিপি, অন্যদিক হইতে আবার উহাই আধুনিক বাঙালীর জীবন-গতির পথ-নির্ণায়ক। এই কারণেই এই পলিটিক্‌স্ শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষেও আলোচ্য এবং বিচার্য। কিন্তু সে আলোচনা ও সে বিচারের শক্তি সকলের আছে এমন নয়। ট্রামে ও বাসে, বৈঠকখানায় এবং সর্ব্বোপরি সংবাদপত্রে ও সভাক্ষেত্রে প্রতিদিনই আমরা তাহার প্রমাণ পাই। অথচ ইহা আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করি—"আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার এই অবস্থা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে।"

মানস ক্ষেত্র

রবীন্দ্রনাথ গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের বাঙালীপ্রয়াসের হিসাব লইতে গিয়া দেখিতেছেন সে প্রয়াস কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় বাঙালীর একটি সর্ব্বনাশী দোষে। "জাতি গড়ার কাজ একলার নয়, এ কাজে মিলতে হবে সকলকে। এই মিলতে বাঙালী পারলে না।" তাই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একার কাজে বাঙালীকে জয়ী করিয়া সার্থক করিয়াছে শিল্পে ললিতকলায়, তাহাই সামাজিক চেতনায় বাঙালীকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে, রাষ্ট্রীয় প্রয়াসে তাহাকে করিয়াছে উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল, অ্যানার্কিক্যাল এবং নিষ্ফল। যাঁহারা আধুনিক বাঙালী জীবন ও বাঙালী কাল্‌চারকে একটু গভীরভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই কবির এই কথাটিকে স্বীকার না করিয়া পারেন না; আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজজীবনের

স্বার্থবুদ্ধি, সমস্ত প্রয়াসকে ব্যক্তিগত করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি, যাহা প্রতিনিয়ত উগ্ররূপে প্রকট হইয়া উঠে তাহার মূল খুঁজিয়া পাইতেও তাঁহাদের দেরী হয় না। কথাটা বিশদ করিয়া বুঝিবার মত। আর্য্যসভ্যতার শৃঙ্খলা কোনো দিন এই প্রত্যন্তবাসীদের স্বনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিবার অবসর পায় নাই; খণ্ড খণ্ড গ্রাম্যসমাজের শাসনে বহুদিন কোনোরূপ বৃহত্তর শৃঙ্খলাবোধ ইহাদের সহজলভ্য ছিল না, প্রয়োজনীয়ও ছিল না। য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সেই সভ্যতার যে বিশেষ রূপটির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটিল সেখানেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজা চলিয়াছে। তাই সহজেই সেই শিক্ষাটুকু ইহারা গ্রহণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু ব্রিটিশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ব্রিটিশ সামাজিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নাই, পরিপুষ্ট করিয়াছে; বাঙালীর সামাজিক-চেতনা ঠিক তেমনি না থাকায় এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কর্ম্মের ক্ষেত্রে এক বিকৃত ব্যক্তিপরায়ণতায়, আত্মসর্ব্বস্বতায় অর্থাৎ স্বার্থ-সর্ব্বস্বতায় পরিণত হইল। অপরদিকে সমাজবিকাশের ধনিকতান্ত্রিক স্তরে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনিবার্য্য ছিল, বিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি আসিয়া যৌথ-শিল্প ও যৌথ-শ্রমের তাড়নায় য়ুরোপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, ব্যক্তিস্বরূপকে মুক্তি দিয়াই যৌথ সমাজ (কম্যুনিষ্টিক কিম্বা কর্পোরেটিভ) জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু বাঙালী সমাজের মধ্যযুগীয় কাঠামোতে এখনও শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা লাগে নাই, সমাজচেতনাই প্রস্ফুট হয় নাই। তাই চীনের মত এখানেও আজও ব্যক্তি-চেষ্টা ও পরিবারগত সচেতনতাই অচল ও স্থাণু হইয়া রহিয়াছে। জাতিগঠনের কাজে হাত দিলেও আমরা মিশিতে পারি না; দল বাঁধিতে গেলে আমরা দলাদলি বাধাইয়া তুলি; শৃঙ্খলামাত্রই আমাদের ব্যক্তিচেতনায় মনে হয় শৃঙ্খল। এই সত্যটি এখানে প্রমাণিত করিবার সময় নাই—রবীন্দ্রনাথও শুধু ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এইখানে এই প্রসঙ্গে শুধু এই একটি কথা স্মরণীয় যে, এক এক মানব গোষ্ঠীর এক একটি বিশেষত্ব থাকে বটে,—নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে সেই বিশেষত্ব জাতির চরিত্ররূপে দৃঢ়মূলও হয়—কিন্তু সেই জাতীয় চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয় নয়। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন ঘটে—রক্তের মধ্যে তাহার এমন কোনো জাতিগত গুণাগুণ নিহিত নাই যাহা তাহাকে কেন্দ্রাতিগ বা কেন্দ্রানুগ, ব্যক্তিমুখীন বা যূথাশ্রয়ী, অন্তর্মুখীন বা বহির্মুখীন করিয়া রাখিবে। খণ্ডিত জার্ম্মানী, বিচ্ছিন্ন ইতালী, নিশ্চেতন রুশিয়া আমাদের চোখের উপর দিয়াই এইরূপ সমাজগত পরিবর্ত্তনের বশে নূতন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছে। শুধু বাঙালীই গ্রাম্য বিচ্ছিন্নতা ও ঊনবিংশ শতাব্দের বিকৃত স্বাতন্ত্র্যবাদের বশে

আপনার সামাজিক চেতনাকে খর্বিত করিবে, আপনার রাষ্ট্রীয় প্রয়াসকে বিনষ্ট করিবে? "এখানে হবে না"—বাঙালীর এই ললাটলিপিকে কোনো সমাজ-বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু কেন মানিয়া লইবেন? কবির নিকটে ইহাই নিবেদন।

তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণকে আর বিশদ না করিয়া এখানে দেখা দরকার—কোন্ বাস্তব অবস্থার বশে বাঙালীর এই ব্যক্তি-সর্বস্বতা প্রশ্রয় পায়, তাহার জাতীয় প্রয়াস নিষ্ফল হয়। গ্রাম্য সভ্যতার বিচ্ছিন্নতা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দের ব্রিটিশ-সভ্যতার ফলও দেখিয়াছি; কিন্তু বর্তমান সময়ে বাঙালী সমাজের বাস্তব পরিবেষ্টনী কোন এক দিক দিয়া প্রতিকূল না হইলে বাঙালী প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই এমন বিকৃত ব্যক্তি-সর্বস্বতায় পরিণত হইতে পারিত না—তাহা সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত হইতে পারিত।

আধুনিক বাঙালী জীবনের বাস্তব পরিবেষ্টনীর হিসাব লইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়াও অন্য যে দুইটি বাঙালী বৈশিষ্ট্য আমাদের ভাবরাজ্যে আসন জুড়িয়া আছে, তাহাদের প্রভাববেরও সন্ধান পাইব। কারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও বাঙালীর ভাবজীবনের অন্য প্রধান লক্ষণ রহিয়াছে—উহা তাহার আবেগ-প্রবণতা আর তাহার তার্কিক তীক্ষ্ণতা। এই দুইটি বিরোধী গুণও একই কালে বাঙালী চিত্তে দেখা যায়। যে বাঙালী নব্য ন্যায়ের স্রষ্টা সে-ই আবার কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা; যে বাঙালী বৈষ্ণব ভাবাবেগে উন্মাদ সে-ই আবার ক্ষুরধার-বুদ্ধি ব্যারিষ্টার। বাংলার জীবনেও এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ঘটিতেছে। বাংলার পলিটিক্সেও তাই এই দুই বিরোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। এক একবার আমরা আবেগের আকাশ-সঞ্চারী আপনাদের সঁপিয়া দিই, আবার বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সূক্ষ্ম রাজনীতিক দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, বিচক্ষণতার প্যাঁচ কষিতে কষিতে আমরাই তখন মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলি। আবেগের বশে যে বাঙালী এমনি করিয়া একেবারে দেউলিয়া হইতে পারে সে কি করিয়া হঠাৎ ধূর্ত বুদ্ধিতে সকলকে পরাস্ত করে এবং আপনার সমস্ত আদর্শকে আয়ত্ত করিবার নামেই আপনার ব্যক্তি-সর্বস্বতার নিকট আপনার অজ্ঞাতে নিজেকেও দেউলিয়া করে? বাঙালী পলিটিক্স্ এই বিরোধীভাবের ক্রিয়াক্ষেত্র বলিয়াই এমন জটিল এবং ক্লান্তিকর। তাই ১৯০৫-এর 'স্বদেশী'র প্রেরণা একদিকে বাংলাকে বিপ্লবী পলিটিক্স্ গ্রহণ করাইল, অন্যদিকে দেশীয় শিল্প গড়িতে উদ্বুদ্ধ করিল, আর সর্বশেষে আপনার স্বার্থের ক্ষুদ্রতায় সব ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

বাংলার বাস্তব জীবনে যদি এই সব গুণের সমন্বয় ঘটিবার সহজ পথ থাকিত তাহা হইলে ভাব-রাজ্যের এই গুণাগুণ পরিবর্তিত হইয়া নূতনরূপ লাভ করিত,

নূতন গুণগ্রামের বিকাশ ঘটিত, এই বিকৃত গতিতে তাহাদের পরিণতি হইত না। বাঙালী পলিটিক্সের মূল অসামঞ্জস্য ভাবরাজ্যের বিষয় নয়—তাহার মূল বাস্তবের ক্ষেত্রেই রহিয়াছে—এইটুকুই আমাদের প্রধান স্মরণীয়।

বাস্তব ক্ষেত্র

জাতি হিসাবে বাংলার সেই বাস্তব সত্যটি কি তাহা বুঝিতে গেলে দেখি—সাড়ে চার কোটি বাঙালীর অধিকাংশই কৃষিজীবী; ইহাদের প্রায় বারো আনা মুসলমান। আর সমস্ত জমির মালিক জনকয়েক জমিদার; ইহাদের চৌদ্দ আনা হিন্দু। মালিক তাহারাই বটে,—কিন্তু মাঝখানে এক দল ক্ষুদ্র বৃহৎ মধ্য-স্বত্বভোগী। তাহারা প্রায়ই হিন্দু। এই জমিদারী জিনিসটি মোটের উপর যেমন লাভের তেমনই সম্মানের,—মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের অন্তরেখা এখনও আছে এই ভূস্বামীদের ললাটে, আর বর্তমানকালীন ধনিকতন্ত্রের উচ্চ মুনাফা এখনও আসে এই জমিদার-পুঁজিদারের পকেটে। তাই এ প্রদেশে শিল্পে অর্থ জুটে নাই, জমি কিনিতেই লোকে ছিল ব্যস্ত। এখানকার শিল্পপতিরা হয় সাম্রাজ্যবাদের নিকটাত্মীয় বিদেশীয় দল, নয় সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পুষ্ট ভিন্নপ্রদেশীয়গণ; আর এখানকার শ্রমিক ভিন্নপ্রদেশের জমিহারা, গ্রামছাড়া অন্নহারা কৃষকের দল—ঠিক বাঙালী কেহই নয়, না মালিক, না মজুর। বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা নয়।

বাংলা দেশের মোটামুটি সমাজবিন্যাস তাই এইরূপ। খাঁটি বাঙালী সমাজ আধা-সামন্ততন্ত্রী, তাহার নীচের তলায় কোটি কোটি মুসলমান কৃষক। তদুপরি এক সচল হিন্দু-প্রধান মধ্যবিত্ত সমাজ—একাংশ তার দরিদ্র, অন্যাংশ ধনী; একাংশের জীবিকা অর্জন করিতে হয় ব্যবসাপত্র করিয়া, চাকরি-বাকরি করিয়া এবং কিছুটা জমির খাজানা পাইয়া বা টাকার সুদ পাইয়া; অন্যাংশের জীবিকা স্বচ্ছল—বড় চাকুরির জন্য, মহাজনীর জন্য, তালুকদারী পত্তনি-দারীর জন্য; আর ইহার উপরে আছে, খাঁটি জমিদারের দল। অন্য দিকে নবারব্ধ শিল্পের মালিক ও শিল্পের শ্রমিক—যাহারা সম্পূর্ণরূপে বাঙালীই হয় নাই।

এই বাংলা দেশে রাষ্ট্রীয় চেতনা হঠাৎ বিদেশীয় শাসনে বিদেশীয় বিরোধ (জেনোফোবিয়া) রূপে জন্মলাভ করিল, আত্মগরিমাবোধ রূপে দেখা দিল প্রথম যাহারা বিদেশীয় সম্পর্কে ও বিদেশীয় বুর্জোয়া সভ্যতার সম্পর্কে আসিল তাহাদের মধ্যে। এই সভ্যতার প্রধান লক্ষণই জাতীয়তাবোধ ও উদার আদর্শ। বাঙালীই ভারতবর্ষে প্রথম বিদেশীয় শিক্ষালাভ করিল এবং প্রথম

'স্বদেশী' হইল। কিন্তু এ বাঙালী কে? কৃষকসমাজ নয়, মুসলমানসম্প্রদায় নয়; উচ্চ শ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুগণ। এই নবজাগ্রত স্বাদেশিকতা 'অতীত গৌরব বাহিনী' বাণী আবিষ্কার করিল, স্বভাবতই তাহার এই ভাবগত বনিয়াদ হইল 'হিন্দু-স্বাজাত্য'। এই শ্রেণীগত ও ভাবগত আদর্শের পরিচয় বহন করিত তাহাদের সেদিনকার দাবী—জমিদারী প্রথা ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত করা হউক (ভূস্বামীদের দাবী); কাপড়ের কলের উপর হইতে উৎপাদন-কর রহিত করা হউক (বোম্বাই ও এই দিককার নবজাত 'স্বদেশী' অর্থাৎ বুর্জোয়ার দাবী); ভারতশাসনে আমাদের স্থানিকটা সঙ্গে করিয়া লও আর এই দেশে আই-সি-এস্ পরীক্ষা গ্রহণ কর (মধ্যবিত্তের জাতীয় দাবী)। এই নূতন প্রয়াস বিপুল উন্মাদনায় বাংলা দেশে রূপ পাইল ১৯০৫-এ। আমাদের ভাবাবেগ সেদিন 'স্বাজাত্যে'র যে সূত্র আবিষ্কার করিল তাহা আজও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেদিন আমরা জানিলাম এবং মানিলাম—"পরাধীন জাতির পলিটিক্স নাই"—যাহা আছে তাহা এক প্রাণধর্মী বিপুল প্রয়াস, মৃত্যুপণে সেখানে জীবন কিনিতে হয়। সেদিন হইতে বাঙালী রাজনীতিক একটি দীক্ষা লাভ করিল—আর বাঙালী মধ্যবিত্ত মাত্রই সেদিন হইতে রাজনীতিকও হইল। সে দীক্ষা বিপ্লবের। ভারতের অন্য প্রদেশ পলিটিক্স্ করে, বাঙালী করে বিপ্লবের চেষ্টা। তাহাদের প্রদেশে তাই 'মডারেট' ও 'লিবারেল' আছে, বাংলা দেশে তাহারা নিশ্চিহ্ন। অন্য প্রদেশে সংগঠনমূলক গান্ধীবাদও বিপ্লবী বলিয়া গৃহীত হয়, বাংলাদেশে তাহা অচল। কিন্তু এই গান্ধীবাদী প্রয়াস ও বাঙালী বিপ্লব-প্রয়াস উভয়ের শ্রেণীগত আত্মীয়তা সুস্পষ্ট; উভয়েই মধ্যবিত্ত সমাজের উপর নির্ভরশীল, বিত্তবানের (বুর্জোয়া) ভাবাদর্শ দ্বারা চালিত। ইহাদের আশা—শিল্পে-বাণিজ্যে বিদেশীয় অধিকার বিলোপ করিব, তাই চাই বিদেশীয় শাসনের বিলোপ। অথচ সাম্রাজ্যবাদের ধর্মই এই যে, শাসন নিজ মুষ্টিতে রাখিয়া শিল্পে বাণিজ্যে পরদেশকে শোষণ করিয়া লও—দরকার মত সেই জন্য পরদেশীয়দের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করিয়া ভক্ত সমাজ সৃষ্টি কর। এই ভক্তসমাজই বিত্তবানের সমাজ—শেষ পর্য্যন্ত তাহারা বিদেশীয়ের উচ্ছেদ চাহিতে পারে না। পূর্ণ স্বাধীনতা কাম্য হয় বিত্তহীনদের (শ্রমিকের), যাহারা শোষণের চাপে পিষ্ট; কাম্য হয় জমিহীন কৃষকের, দরিদ্র ঋণপিষ্ট করভারাক্রান্ত রায়তের; আর বেকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের। অতএব, পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য যে-সব বিপ্লবী মন কৃতসঙ্কল্প হয় ১৯০৫ হইতে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের ক্রমবর্দ্ধিত জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া, তাঁহারাও ক্রমশঃই জন-সাধারণের সাহায্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রথমত মধ্যবিত্ত সমাজের

দ্বিধাশঙ্কাগ্রস্ত সংগ্রামশক্তির শেষ ও সুনিশ্চিত পরিচয় লাভ করিয়া, দ্বিতীয়ত আপনাদের গোপন আবেগের ও সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের অসামঞ্জস্য বুঝিয়া, তৃতীয়ত কংগ্রেসের ক্রম-বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ক্রমপরিস্ফুট রূপ এবং ক্রমবিকশিত আদর্শ (পূর্ণ স্বরাজ) উপলব্ধি করিয়া, চতুর্থত আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী এবং সর্ব্বোপরি ইতিহাসের ধারার স্বরূপ ও সাম্যবাদের আসন্ন বিজয় লক্ষ্য করিয়া, বাংলার সেই রাষ্ট্রকর্ম্মীর দল কারাগারে ও তাহার বাহিরে বসিয়া আপনাদের রাষ্ট্র-আন্দোলনের কর্ম্মধারা স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের মতের ও আদর্শের তফাৎ ছিল অনেক। কেহ বা জাতীয়তাবাদী, কেহ বা সমাজতন্ত্রী, কেহ বা সাম্যবাদী; কিন্তু সকলেই ছিলেন একমত যে, ভারতীয় স্বাধীনতার সম্মিলিত সাধনাক্ষেত্র কংগ্রেস—যদিও আজ তাহা সংস্কারধর্ম্মী গান্ধীবাদের দ্বারা অধিকৃত;—আর ভারতীয় স্বাধীনতার সৈনিক জনগণ—যদিও আজ তাহারা রাজনৈতিক বিষয়ে অচেতন। অতএব কংগ্রেসকে গণসঙ্ঘ করিয়া তুলিতে হইবে, আর জনগণকে করিয়া তুলিতে হইবে রাজনীতিক সংগ্রামে সচেতন। এই আদর্শ লইয়া বাংলার রাষ্ট্রকর্ম্মীরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

মূলত এই একই রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার বশে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্র-কর্ম্মীদের মধ্যেও এই সময়ে এইরূপ চেতনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সনের আন্দোলনের পরিণতি হইতে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন, ভারতীয় আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণতি লাভ না করিলে স্বাধীনতা-লাভ সম্ভব নহে। তাঁহাদেরও মনে রুশীয় সাম্যবাদ ও পৃথিবীর ভয়াবহ আর্থিক অরাজকতায় সমাজ-তান্ত্রিক নীতির এক অস্পষ্ট ছায়াপাত হয়। বরং এই সময়ে বাংলা দেশের উপরে সরকারী সন্ত্রাস-বাদ ও দলন ব্যবস্থা চাপিয়া বসিয়াছিল; তাই বাংলা রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও রাষ্ট্রীয় প্রয়াস স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রকাশ পায় নাই। তাহার প্রকাশ ঘটিল বাংলার বাহিরে—নিখিল ভারতীয় কিসান সভা গঠিত হইল, কংগ্রেসের মধ্যেও একটা সমাজতন্ত্রীদল উদ্ভূত হইল, অপর দিকে পণ্ডিত জওহরলাল ভারতব্যাপী এই গণ-স্বরাজের বাণী জিহ্বাগ্রে বহন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই অবাঙালী রাষ্ট্রকর্ম্মীদের একটা সুবিধা ছিল—তাঁহারা বাংলার মত বৈপ্লবিক দলের গোপন পথে পলিটিক্সে পদার্পণ করেন নাই। তাই গুপ্ত আন্দোলনের অপরিহার্য্য বিকৃতিগুলিও তাঁহাদের কবলিত করিতে পারে নাই। ফলে (১) তাঁহারা কংগ্রেস আন্দোলন দ্বারাই গঠিত হইয়াছেন, কংগ্রেসকে নিজের বলিয়া চিনিয়াছেন; (২) কোন ক্ষুদ্র খণ্ডিত গণ্ডী নীতিদ্বারা চালিত হন না; (৩) তাঁহারা শৃঙ্খলা মানিতে অভ্যস্ত—দলাদলি কম বুঝেন। কিন্তু ইহার অসুবিধার দিকটিও ছিল সুস্পষ্ট। যে

আবেগ বৈপ্লবিক পথে বাঙালীকে চালিত করে অ-বাঙালী রাষ্ট্রকর্মীর নিকট তাহা অজ্ঞাত। উহার উন্মাদ প্রকাশকে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিতেন—প্রকাশ্যে বাঙালী বৈপ্লবিক প্রেরণাকে নিন্দাও করিতেন, কিন্তু সেইরূপ প্রকাশই নিজেদের মধ্যে কোথাও দেখিলে গর্ব্ব বোধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না—মনে মনে হয়ত একটা আত্মবিশ্বাস জন্মিত, 'হাম লোগংকো লেড়কালোগ ভি বাঙালীকা মাফিক জান কোরবানি দেনে শক্‌তা হৈ'; ইহাই ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের পূজার কারণ। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের সহিত সাধারণ রাষ্ট্রকর্মীদের সম্পর্ক ছিল না, এই প্রেরণা তাহাদের স্পর্শও করে নাই। ফলে, (১) রাষ্ট্রকর্মী হিসাবে তাঁহাদের তীব্র কর্ম্মপ্রেরণা নাই; (২) তাঁহারা কংগ্রেসের মামুলি কথাকেই নিজেদের নীতি বলিয়া জানিয়াছেন, উহাকে যাচাই করিতে শিখেন নাই; (৩) আর সংখ্যায়ও তাহারা বাংলাদেশের কর্ম্মীদের অপেক্ষা কম। এক কথায় রাজনীতিক অভিজ্ঞতায় তাঁহারা কাঁচা। নিখিল ভারতীয় যে-কোনো রাষ্ট্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাংলার রাষ্ট্রকর্মীদের সহিত অন্য যে-কোনো প্রদেশের রাষ্ট্রকর্মীর তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে পঁয়ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বৃথা যায় নাই।

গণসংযোগে ব্যর্থতা

তথাপি বাঙালী রাষ্ট্রকর্মীর ললাটে নিষ্ফলতা জুটিল। গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বাঙালী এবার পথ করিয়া লইতে পারিল না। ইহার এক কারণ, যাহারা গুপ্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়া গঠিত, উহার নীতির দ্বারা পরিচালিত, গণ-আন্দোলনে তাহারা যেন পথ খুঁজিয়া পায় না। তদুপরি এই অতি-আবেগগ্রস্ত বিপ্লবীরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের; অশিক্ষিত গণ-জনের দেহের স্পর্শ বা মনের স্পর্শ তাহাদের পক্ষে সুখকর নয়। তাই ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, ভলাণ্টিয়ার কোর্ প্রভৃতি মধ্যবিত্ত আন্দোলনে তাহারা যেমন স্বচ্ছন্দতা বোধ করে, কৃষক আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনে তাহা লাভ করে না। ইহাদের শ্রেণী-স্বার্থও অবশ্য উহার বিরোধী। কিন্তু মোটামুটি সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থের হিসাব করিয়াই যে এই রাষ্ট্রকর্মীরা ঐ দিকে কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন হইতে দূরে রহিয়াছেন, এই কথা সত্য নহে। মধ্যবিত্ত মনোভাবই তাঁহাদের পক্ষে দুস্তর বাধা, মধ্যবিত্ত স্বার্থ নয়। বরং যাঁহারা সেই মধ্যবিত্ত স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন তাঁহারা ইটালী, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের মধ্যবিত্ত-নায়কত্বের কৌশল ও শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে নিজেদের আওতায় আনিতেই সচেষ্ট। ইঁহারা জন-গণ হইতে দূরে থাকেন না,—প্রয়োজন-

বোধে মালিকের সহায়তায় মজুর সমিতি গঠন করেন, ভারতীয় শিল্প প্রসারের জন্য আন্দোলন করেন, কৃষকের অধিকারের কথা পাড়েন, আবার প্রয়োজন-বোধে একেবারে 'সোশ্যালিজম', 'কম্যুনিজম্' 'মজদুর লড়াই', 'কৃষক বিপ্লব', 'লেলিন' 'ট্রটস্কি' পর্য্যন্ত চালাইয়া যান। এক কথায়, ইঁহারা জানেন গণদেবতা শক্তিশালী, কিন্তু বুদ্ধিমান নহে; তাহাকে হাত করাটাই প্রয়োজন, তারপরে তাহাকে কিছু কঁদলী বৃষ্কাদি উদরস্থ করিতে দিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া মোটেই দুঃসাধ্য নহে। মোটের উপর বাংলার গণ-আন্দোলনে এই মধ্যবিত্ত-নায়কত্বের পথ পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই সম্ভাবনাও সুদূর। গণ-শক্তি এখনও বাঙালী রাষ্ট্রকর্মীদের আয়ত্তের বাহিরে।

ইহার আসল কারণটি শুধু কর্ম্মীদের মধ্যবিত্ত মনোভাব নয়, তাহাদের শ্রেণী-স্বার্থ বা শ্রেণী সংস্কার নয়। কারণ শত শত রাজনৈতিক কর্ম্মী আছেন যাঁহারা জীবন-যাত্রায় বিত্তহীন, গণ-ধর্ম্মী, শুধু মনে-মনে নয়, 'সেণ্টিমেণ্ট্যালী' নয়, প্রাণে মনে। গণ-আন্দোলন ইহাদের ধর্ম্মস্বরূপ। কিন্তু ইঁহারাও গণ-আন্দোলনে প্রবেশপথ আজ পাইতেছেন না। ইহার কারণ, বাঙালী জনগণের বৃহত্তম অংশ মুসলমান কৃষক; আর এক অংশ অ-বাঙালী মজুর। মজুরেরা অধিকাংশ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থান করে, মফঃস্বলের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর ইহাদের সহিত পরিচয়ও ঘটে না। ইহাদের সত্যকার সংস্পর্শে আসা শহরের রাষ্ট্রকর্ম্মীর পক্ষেও কঠিন হইল কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বাঙালী রাষ্ট্রকর্ম্মী অ-বাঙালী মজুরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধা একটু পায়। তাহা তেমন কিছু নয়। বড় বাধা—মালিক, সরকার ও মজদুর আন্দোলন-ক্ষেত্রের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ। মজদুর আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্যকার বিপ্লবী হইতে মালিক-পোষিত নেতা পর্য্যন্ত নানা ধরণের নেতা আছেন—অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতাসংরক্ষণ ও ক্ষমতাপ্রসারে ব্যস্ত, একটা সুনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের মধ্যে কেন্দ্রিত হইতে চান না। কানপুর মজদুর সভা বা বোম্বাই'র টেক্‌স্টাইল ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলার চটকল মজদুর ইউনিয়নের তুলনা করিলেই কথাটি বুঝা যায়। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মজদুর আন্দোলনে সত্যকারের ট্রেড-ইউনিয়ন গুণই বিকাশ লাভ করে না, রাষ্ট্রীয় শক্তি আসিবে কোথা হইতে? তাহা ছাড়া, যাঁহারা মজদুর আন্দোলনকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহেন তাঁহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রে টিকিবার উপায় নাই। সরকার ও মালিক বাধা দেয়, কর্ম্মীরা সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন, তাঁহাদের ইউনিয়ন বা মজদুর সভার সদস্যগণ কাজ হারায়। এদিকে মালিকের হাতে গড়া ইউনিয়ন

গজায়; তাহা সরকারী অনুমোদন-লাভ করে, আর উহার সভ্যরা মালিকের দ্বারা পুরস্কৃতও হয়। এই কারণে রাষ্ট্রকর্মীদের গঠিত ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া যায়; আর অন্যবিধ নেতাদের ইউনিয়নের বাড়ি-ঘর, আসবাব-পত্র, সদস্যসংখ্যা দেখিয়া মজদুর আকৃষ্ট হয় এবং শ্রমিক-গবেষক সমাজ ধন্য ধন্য করে। মোটের উপর বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে সত্যকার রাষ্ট্রকর্মীর স্থান সঙ্কীর্ণ।

এই শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবার ইহার উপর দেখিতে না দেখিতে মোসলেম লীগের কলওয়ালার সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাষ্ট্রকর্মীরা যেখানেও বা ছিলেন সেখানেও পরাস্ত হইতেছেন। তাই যদি এই শ্রমিক আন্দোলন কোনো দিন মধ্যবিত্ত স্বার্থ রক্ষণের উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্ত-নায়কত্ব দ্বারা অধিকৃত হয় সে মধ্যবিত্ত নায়কত্ব বাংলার পরিচিত রাষ্ট্রকর্মীদের দ্বারা গঠিত হইবে না—গঠিত হইবে এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মধ্যবিত্তদের দ্বারা। বাংলায় ক্যাসিজম্ যদিই জন্মায় তবে জন্মাইবে কম্যুনাল ফ্যাশিজম্ রূপে।

এইখানেই মূল সমস্যাটি—এই সাম্প্রদায়িকতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বাংলার রাষ্ট্রকর্মী মজদুরক্ষেত্রে ইহার জন্য আর টিকিতে পারিতেছেন না এবং ইহার জন্যই বাংলার কৃষকের সম্মুখে সে উপস্থিতও হইতে পারেন নাই। বাংলার কৃষক মুসলমান, বাংলার রাষ্ট্রকর্মী বেশীর ভাগ হিন্দু, অধিকন্তু প্রায় সকলেই ভদ্র মধ্যস্বত্বভোগীদের সন্তান। ব্যবধান একটা রহিয়াছেই। ব্যবধানটি দীর্ঘতর হইল কি করিয়া তাহা অতিসংক্ষেপে বুঝা দরকার। আমাদের রাষ্ট্রচেতনা প্রথম যখন জন্মাইল, জন্মাইল এই হিন্দু শিক্ষিতের মধ্যে। ইহার ভাব-গত উপাদান হইল হিন্দু গৌরব, 'শিবাজী উৎসব', রাজস্থানের গল্প। ইহার নায়ক ছিলেন রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি। তাঁহাদের চিন্তায় মুসলমান ছিল বিদেশী এবং নগণ্য—যেমন আজিকার সাঁওতালেরা। 'স্বদেশী' আন্দোলন যে ভাবজীবনকে সম্বল করিল তাহাও হিন্দু। উহার মধ্য দিয়া আমরা এক নূতন হিন্দুর সংস্কৃতিরই যেন প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম। তাই বৈপ্লবিক বাঙালীকর্মীর জীবনের মধ্য দিয়া ত্রিশ বৎসর কাল বিবেকানন্দ অরবিন্দ হিন্দু সংস্কৃতির জয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাই সাধারণ মুসলমান রবীন্দ্রনাথের আবেদনকেও স্বদেশীর দিনে প্রত্যাখ্যান করিবার পক্ষে এই যুক্তিই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন—"আমি মুসলমান।" এদিকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে যখন গান্ধীবাদ ও আর্য্যসমাজ সুরু হইল তখনও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নিসন্দিগ্ধ হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের খেলাফতের ধর্মগত আবেগকে পুঁজি করিয়া আমাদের স্বরাজে কিছুদিন লাগাইলাম। সেই একদিন বাঙালী জন-সমাজের সহিত বাঙালী রাষ্ট্রকর্মীর সংযোগের পথ পাওয়া গিয়াছিল,

আসলে যে পথটাই ছিল অন্ধগলি, তাই অচিরেই তাহা বন্ধ হইল। কিন্তু ইহার ফলে বাঙালী মুসলমান তাহার রাজনৈতিক শক্তির সন্ধান পাইল এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় জ্ঞানবান্ হইল। হিন্দু স্ব-জাত্যের মত এই মুসলিম-চেতনা ইসলামী সংস্কৃতির নবাবিষ্কারে ব্যস্ত হইল।

এই সুবৃহৎ মুসলিম শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া অচিরে বাঙালী মুসলমান সমাজের মধ্যে মুসলমান বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের শ্রেণী দণ্ডায়মান হইল। সরকারী ভেদ-ব্যবস্থা তাহাদের হাতে মুসলমান সম্প্রদায়কে তুলিয়া দিল। সত্যকারের জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে প্রায় বিনষ্ট করিল। স্ব-সমাজে তাঁহারা আসন হারাইলেন—কারণ মুসলমানসমাজের চক্ষে জাতীয়তাবাদ ১৯০৫ হইতেই হিন্দু জাতীয়তাবাদ রহিয়া গিয়াছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদীদের সমাজেও ইহাদের প্রভাব রহিল না, কারণ ইঁহাদের অনুচর নাই। মুসলিম বিত্তবানের দল দেখিলেন এই মুসলিম মনোভাবটির উপরে তাঁহাদের নূতন সৌভাগ্যের বনিয়াদ গড়া সম্ভব, মুসলিম মধ্যবিত্ত দেখিলেন এই মুসলিম কথাটিকে সম্বল করিয়া হিন্দু মধ্যবিত্তের স্থানটি তাঁহাদের কাড়িয়া লওয়া সহজ। তাই বিত্তবান (অবাঙালী) মুসলমান মুসলিম চেম্বার অব কমার্স গড়ে আর মধ্যবিত্ত মুসলমান—যাঁহারা অধিকাংশই কংগ্রেস খেলাফতের মধ্য দিয়া আন্দোলনের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন এবং যাঁহারা চাহেন চাকরি—'মুসলিম লীগের' ঝাণ্ডা উড়ায়।

ইহাদের লক্ষ্য মুসলমান জনগণ—তাহাদেরই নাম ভাঙ্গাইয়া এই বিত্তবান্ ও মধ্যবিত্তদের খাইতে হইবে। অতএব ইঁহাদের প্রধান আক্রোশ হইল তাহাদের উপর যাঁহারা জনগণকে শোষণ-মুক্ত করিতে চায়; যাহারা বলিতে চায়, সাম্প্রদায়িকতা শোষণেরই একটা কৌশল, যাঁহাদের রাষ্ট্রমন্ত্র—"কৃষক শোষণমুক্ত হউক, শ্রমিক শোষণ মুক্ত হউক।" অর্থাৎ বাংলার গণ-আন্দোলনের কর্মীরাই হইল ইঁহাদের সরকারী বেসরকারী আক্রমণ-স্থল। কর্মীরা প্রায়ই হিন্দু; অতএব আক্রমণ সহজসাধ্য; আর বাংলা সরকার মুসলমান বিত্তবান্দের হাতে, অতএব এই 'ইসলামের জিগীর' রোধ করিবার কেহ নাই।

মোটের উপর এই সব কারণে বাংলার কৃষককে বাংলার রাষ্ট্রকর্মী রাষ্ট্রীয়-চেতনা দানের সুযোগ পাইল না।

গণ-আন্দোলনের দুয়ার যখন উন্মুক্ত হইল না, তখন রুদ্ধাবেগ রাষ্ট্রীয়কর্মী পুরাতন পরিচিত হিন্দু-সমাজের মধ্যে সেই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডীতেই আবার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ; শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক

ছাত্রদল ও সাধারণ কংগ্রেস-ভাবগ্রস্ত ভদ্র স্তর। সংখ্যায় কয়জন তাঁহারা? কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রকর্মীর সংখ্যা কম নয়। সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে অধিক কর্ম্মীর ভিড় জমিল—ফল সহজেই অনুমেয়। এইরূপ স্থলে এই পরিচিত ক্ষেত্রে পুরাতন যে গীতামোহ ও দলাদলি ছিল তাহাই পুনরায় জাগিয়া উঠিল। রুদ্ধাবেগ বৈপ্লবিক প্রেরণা এইবার বিকৃত রূপ লাভ করিল—তাহার বশে বাঙালীর বুদ্ধি যে ছলচাতুরীর আশ্রয় লইল তাহা দেখিয়া একদা চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, "পঁচিশ বৎসর ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস্ করিয়া যাহা দেখি নাই পাঁচ বৎসরের পলিটিক্সে তাহা অপেক্ষা বেশী দেখিলাম।" এই পনের বৎসরে সেই চতুরতা প্রত্যেকটি শাখাকংগ্রেসের মধ্যেও পনের গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাঙালীর আত্মসর্ব্বস্বতা, বাঙালীর নিঃসঙ্কোচ চাতুরী এইবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—মাথা ফাটিল, খুনাখুনি হইল।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গণ-আন্দোলন পথ না পাইলেও আজও কোনো দল তাহার কার্য্যক্রমে কৃষকমজুরের নাম করিতে ভুলেন না। কিন্তু কার্য্যত এখন যাহা চলিয়াছে কংগ্রেসে ছাত্র আন্দোলনে, যুব-সমাজে,—সম্ভবত কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যেও—তাহাকেই কবি বলিয়াছেন "ঘর ভাঙাভাঙির খেলা।"

আসলে ইহার কারণ, বাঙালী পলিটিক্স মধ্যবিত্তের পলিটিক্সই রহিয়া গিয়াছে—বিত্তহীনের পলিটিক্স্ হয় নাই।

ভারতবর্ষের প্রদেশে জনগণ প্রধানত মুসলমান নহেন, যে সব কর্ম্মীরাও হিন্দু এবং মধ্যবিত্তের-মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত নহেন, সেখানে কর্ম্মীদের এই অসুবিধাটি ঘটে নাই। সেখানকার সুপরিসর কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মীরা আপনাদের সার্থকতার সুযোগ পাইতেছেন। এই কারণে বাঙালী কর্ম্মীর তুলনায় অনগ্রসর হইলেও তাঁহাদের গণ-আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছে—তাই, ভারতীয় রাষ্ট্রমঞ্চেও তাহাদের আসন পড়ে বাঙালী কর্ম্মীর অনেক আগে। ইঁহাদেরও সার্থকতার পথ জুড়িয়া আজ দাঁড়াইতেছে একটি জিনিস—গণ-আন্দোলনের প্রতি বিত্তবানের অধিকৃত কংগ্রেসের সংগ্রামবিমুখীন অবিশ্বাস। কংগ্রেসকে এই নেতৃত্বের অধিকার হইতে মুক্ত করিবার মত রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা এই কর্ম্মীদের নাই; আবার কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিবার মত ইচ্ছাও তাঁহাদের নাই। তাই হয় তাঁহারা তাঁহাদের চালিত নবজাত গণ-আন্দোলনকে নিজেরাই বিনষ্ট করিবেন, নয় গণ-আন্দোলন তাঁহাদের আগাইয়া লইয়া চলিবে—কংগ্রেস ছাড়াইয়া কিংবা কংগ্রেস-নেতৃত্বকে ছাড়াইয়া। এই সব প্রদেশের সঙ্কট—জাতীয় নেতৃত্বের শোচনীয় পরাজয়ে; বাংলার সঙ্কট—গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কর্ম্মীর পরাভবে।

বর্ত্তমানের পথ কি?

জিজ্ঞাস্য করা যাইতে পারে—ইহার কি কোনো পথ নাই? পথ যাহা আছে তাহা সংক্ষেপে এই—বাধা আমাদের কর্ম্মীদের আত্মকলহ, তাহা মেটানো; আর মৌলিক বাধা—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, তাহা দূর করা।

প্রথম বাধা অপসৃত হয় (১) যদি বাঙালীর কার্য্যক্ষেত্র সুপরিসর হয়, অর্থাৎ মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে কর্ম্মীরা যদি অগ্রসর হইতে পারেন। ইহাই তো মৌলিক বাধা। (২) দ্বিতীয়ত, বাঙালীর যদি আদর্শবাদ আবার কোনো আবেগের দ্বারা সঞ্জীবিত হয় তাহা হইলে এই বিকৃতির অবসান ঘটে। তাহার একটি মাত্র পথ ছিল—কোনো একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম গঠন করিয়া তোলা। আমরা 'রণং দেহি' বলিয়া এত তাল ঠুকিয়াছি যে আজ সত্যই সংগ্রাম আর আরম্ভ করিতে পারিব লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। অবশ্য, ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পক্ষেও একটি বড় বাধা আছে—সেই গণ-জাগরণের অভাব। অতএব, এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রামও যদি আরম্ভ করা যায় তাহার এক-আধটুকু সার্থকতা দেখিলে লোকে ভরসা লাভ করিত, সংগ্রাম ব্যাপক হইতে পারিত। সে আয়োজন কি হইতেছে মজুরদের 'মাগ্‌গি-ভাতা'র দাবী লইয়া? কৃষকদের ঋণ মকুবের দাবী লইয়া? বিশ্বতপ্রায় রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন তুলিয়া?

কিন্তু মৌলিক বাধাই আসল বাধা। কি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দূর হয়—গণ-আন্দোলনের পথ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীর নিকট উন্মুক্ত হয়? ইহার দুইটি পথ আছে—(১) বিত্তহীনদের আর্থিক দুর্গতিকে ভিত্তি করিয়া অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া চলা—বুঝাইয়া দেওয়া সাম্প্রদায়িকতা শুধু ধনিক ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থ প্রসারের কৌশল। এই প্রচারের আশ্রয়স্থল একেবারে দরিদ্র জনগণ। বঙ্গীয় কৃষক সভা এই পথই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এখানেও স্বীকার করিতে হয়, উহার চেষ্টা উপর হইতে সাম্প্রদায়িক প্রচারের দ্বারা বাধা না পাইলে অনেক বেশী কার্য্যকরী হইত। উপরে যদি কংগ্রেস লীগ, হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমান মধ্যবিত্তরা একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিত, নীচেকার গণ-সমাজে তাহা হইলে উপর হইতে এত বিষ ছড়াইয়া পড়িত না—নীচ হইতে বনিয়াদ গড়া সহজ হইত। (২) উপরতলার মুসলিম নেতাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা। বলা বাহুল্য ইহাতে শ্রেণীস্বার্থের বনিয়াদ পাকা হইবে। জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাহা সম্ভব হইবে না। তথাপি ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন সংক্রান্ত চুক্তিতে ইহারই একটি পথ দেখা যায়।

কিন্তু ইহা চালাকী, ইহা পলিটিক্সের পথ; বিপ্লবের পথ নয়। বড় জোর ইহার সাহায্যে খানিকটা কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। সত্য বটে চালাকীর দ্বারা মহৎ কর্ম্ম হয় না। কিন্তু পলিটিক্স মহৎ কর্ম্ম নয়। মহৎ কর্ম্ম—স্বাধীনতাসংগ্রাম।

মোটের উপর, সংগ্রামে এইরূপ কোনো চুক্তিমাত্রই অন্যায় নয়। এই চুক্তিতে মুস্‌লিম মধ্যবিত্তের চাকরি ও ক্ষমতা কলিকাতার নগর-শাসনে স্বীকৃত হইল—এমনি করিয়া কি হিন্দু মধ্যবিত্তেরও সেই দাবী বাংলা শাসনে স্বীকৃত হইবে? এবং তাহাতে কি মুস্‌লিম জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র-কর্ম্মীদের আন্দোলনের পথ বিস্তৃত হইবে? মুস্‌লিম জমিদার বিত্তবান ও মধ্যবিত্তরা কি নিজেদের এই আসল সাম্প্রদায়িক শক্তিকেন্দ্রকে—বাংলার মুসলমান কৃষকদের—অন্যদের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিবেন? নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ—কৃষকদের শোষণ—ধ্বংস করিবার পথ করিয়া দিবেন? অবশ্য তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বের উদ্ভবও এইভাবে হইতে পারে—কিন্তু তাহা 'রিয়েক্‌শনারী' হওয়া সম্ভব। আবার, উভয়লীগ নেতাদের একটা ভাগ-বাটোয়ারা ভারতীয় কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতে হইলে অবশ্য লীগ শক্ত থাকিবে, কিন্তু বাংলায় রাষ্ট্রকর্ম্মীদের বিভেদ আরও পাকা হইবে। তাহা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঐরূপ অসাম্প্রদায়িক মন্ত্রিত্বের পক্ষপাতী হইবার সম্ভাবনা—আর যাঁহারা এখন মন্ত্রিত্ব করিবেন দুই বৎসর পরে নির্ব্বাচন কালে তাঁহাদেরই সুবিধা হইবার কথা। কিন্তু তাহা হইলে কি বর্ত্তমান বাংলার রাষ্ট্র আন্দোলন কন্‌ষ্টিট্যুশ্যন্যাল ও রিফর্মিষ্ট পথকেই অবলম্বন করিবে না? আর, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের মুখে আমাদের পক্ষে একই কালে মন্ত্রিত্ব চালানো ও সংগ্রাম চালানো কি করিয়া সম্ভব? কিন্তু ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন, বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় যেদিক হইতে যতটুকু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে রাখা যায় তাহাতেই সুযোগ ও সুবিধা হইবার কথা।

মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী

১

একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পুনরাবির্ভাব বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্ত্তন যে পথে হইতেছিল যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই তাহাতে ছেদ পড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধের পটভূমিকায় বিভিন্ন মতবাদ ও কার্য্যক্রমের আবর্ত্তে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে যে কি পরিমাণ প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। কংগ্রেস হইতে সুরু করিয়া মুস্‌লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, লিবরল ফেডারেশ্যন, সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, রায়পন্থী, ফরওয়ার্ড ব্লক পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, দল এবং উপদল সকলেই যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতেছে ও নিজেদের কার্য্যক্রম স্থির করিতেছে। সকলের মুখেই আজ এক প্রশ্ন—"যুদ্ধে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?"

অবশ্য যুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমাদের কোনও যোগ নাই। অর্থাৎ আমরা ভারতবাসীরা নিজেদের কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থের খাতিরে জাতি হিসাবে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দিই নাই। আমাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তাহা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর। ভারতবর্ষীয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের যুদ্ধরত অবস্থা (state of belligerency) ঘোষণা করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতবর্ষের ইহা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে, বৃটিশ অধিকারের সমস্ত দেশই জার্ম্মাণীর শত্রুপক্ষীয় বলিয়া গণ্য; এবং জার্ম্মাণীর অধিকৃত সমস্ত দেশই বৃটেনের শত্রুপক্ষীয়ের মধ্যে গণ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা নাই বলিয়া আমরা যুদ্ধে যোগ দিয়াছি বা যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছি এইটাই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সত্য।

কিন্তু আমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা না থাকিলেও আমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-চেতনা আছে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রজাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা আছে, স্বতন্ত্র স্বার্থবোধ আছে এবং দাবীদাওয়া আছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতার অনুভূতি এবং দাবী আমাদের মনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র রচনা করিবার ইচ্ছা এবং প্রেরণা জোগাইয়াছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলন তো সেই ইচ্ছারই সক্রিয় প্রকাশ মাত্র। জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া কখনও আবেদন নিবেদনের পথে, কখনও প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের পথে, কখনও বা গুপ্ত বিপ্লবপ্রচেষ্টা এবং আতঙ্কবাদের পথে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি। কাজেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া আমাদের যুদ্ধে জড়িত করায় আমাদের আত্মাভিমানই যে কেবল ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা নয়, যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় আমাদের কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হইতে পারে স্বতন্ত্র জাতীয় স্বার্থবোধের জন্য সেই হিসাবও আমাদের মনে জাগিয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ কি পরিমাণ বজায় থাকিবে বা কতদূর ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা আজ আমাদের খতাইয়া দেখিতে হইতেছে। কারণ যুদ্ধে যোগ দেওয়া মানেই নৈতিক সহানুভূতি ছাড়াও আমাদের লোকবল, অর্থবল, উৎপাদন, ব্যবস্থা ইত্যাদিকে প্রভূত পরিমাণে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োগ করা, বিপুল করভার মাথায় তুলিয়া লওয়া এবং সর্ব্বোপরি আমাদের যুবশক্তিকে অগণিত সংখ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য পাঠাইতে প্রস্তুত হওয়া। সহজেই অনুমেয় যে আমাদের স্বার্থের খতিয়ানে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা না দেখিলে আমরা ইহাতে সম্মতি দিব না।

অবশ্য আমাদের সম্মতি অসম্মতি ছাড়াও যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যাহা কিছু দরকার তাহা সে লইবেই। কিন্তু আমাদের সম্মতি অসম্মতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একেবারে উপেক্ষা বা অবহেলার বস্তু নয়। গতবারকার (১৯১৪-১৮) যুদ্ধের সময় আমাদের জাতীয় স্বতন্ত্রতাবোধ এত সুস্পষ্ট এবং ব্যাপক ছিল না, আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ ছিল, সংগঠনও দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে একটা চাপা বিরোধের ভাব, বিপ্লবীদের গুপ্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা (তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও এবং জনসাধারণের সহিত তাহাদের কোনও যোগ না থাকা সত্ত্বেও), এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে নরমপন্থী নেতাদেরও যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের দাবী বৃটিশকে বিচলিত ও চিন্তিত করিয়াছিল। এই

পঁচিশ বৎসরে আমাদের জাতীয় স্বতন্ত্রতাবোধ তীব্রতর হইয়াছে, আমাদের সংগঠন ব্যাপক ও প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছে এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চেতনা আমাদিগকে পূর্ব্বের চেয়ে বহুগুণে বেশী আত্মপ্রত্যয়শীল করিয়াছে। আজ আমাদের সহযোগিতার অভাব কিম্বা সক্রিয় বিরোধিতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বহুল পরিমাণেই ব্যাহত করিতে পারে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সে কথা জানে এবং জানে বলিয়াই বৃটেন আজ যুদ্ধে ভারতবাসীর পূর্ণ নৈতিক ও ব্যবহারিক সমর্থন চায়।

জাতি হিসাবে ইংরেজদের অস্তিত্বকেই এইবারকার যুদ্ধ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে—গ্রেট বৃটেনের ইতিহাসে বৃটিশ জাতি এত বড় বিপদের সম্মুখীন আর বোধ হয় কখনও হয় নাই। কাজে কাজেই সাম্রাজ্যের ভিতর কোনও প্রকার অসন্তোষ বা অশান্তির সৃষ্টি যাহাতে না হয় এবং নির্বিঘ্নে যাহাতে সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে পারা যায় সে চেষ্টা বৃটিশ শাসকবর্গকে আজ নিজেদের গরজেই করিতে হইতেছে। ভারতবাসীর জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবোধকে যতদূর সম্ভব তৃপ্ত করিয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাহার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও যথেষ্ট ব্যগ্র। তাহার এই ব্যগ্রতা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলিকে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী করিয়াছে। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপদে জাতি হিসাবে আমাদের দাবীদাওয়াকে অন্ততঃ আংশিকভাবেও সাফল্যমণ্ডিত করিবার একটা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মুখে ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকার না করিলেও এই সুযোগের পুরাপুরি সুবিধা লইবার ইচ্ছা অন্নবিস্তর সকল দলেরই আছে। তাহার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই আদর্শ ও মতবাদ নির্ব্বিশেষে এদেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলই—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা—নিজেদের দাবীর পরিমাণ বেমক্কা রকম বাড়াইয়া দিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এই সমস্ত দাবী স্বীকার করিয়া নিয়াছে বা নিবেই তাহা নয়। আপাততঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবল দর কষাকষি করিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু দরকষাকষি করার ভিতর দিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে অন্ততঃ আংশিকভাবেও দাবীপূরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বাধ্য হইয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ক্ষোভ ইহাতে হয়ত কিছুটা প্রশমিত হইয়া থাকিবে। তবে মোটের উপর যুদ্ধের ফলে বিনা আয়াসে আশু রাজনৈতিক সাফল্যের সম্ভাবনা রাজনৈতিক দলগুলিকে ও তাহাদের নেতৃস্থানীয়দের একটা আশা-উদ্বেগ-জড়িত 'সাস্‌পেন্‌ডেড অ্যানিমেশনে'র অবস্থায়

আনিয়া উপনীত করিয়াছে। সহজেই বোঝা যায়, আমাদের প্রাক্-সামরিক রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় কেন ছেদ পড়িয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ ও গ্রেট বৃটেনের সম্পর্কের মধ্যে 'ব্যালান্স অফ ফোর্স'-এর যে তারতম্য ঘটিয়াছে তাহাতে সে সম্পর্কে পূর্বতন অবস্থা আর কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহার পরিবর্তন হইতেই হইবে। দুই পক্ষই এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সচেতন। ভারতবর্ষের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিশেষ করিয়া এই চেতনাই তাহার রাজনীতির মোড় ঘুরাইয়া দিতেছে। য়ুরোপের ইতিহাসে অনুরূপ অবস্থায় কাভুর, মাসারিক, পিলসুডস্কীর রাজনীতির উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কি হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিতের গর্ভে নিহিত।

২

ভারতবর্ষ ও গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্ক, তাহাদের নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ ও লাভ ক্ষতির কথা ছাড়াও বর্তমান যুদ্ধের অন্য একটি দিক আছে। বৃহত্তর বিশ্ব-ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে এ যুদ্ধ সমগ্র জগৎ ও মানব সভ্যতার পক্ষে যে একটা দ্রুত আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সূচনা করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। লেনিনের কথায় বলিতে গেলে যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের একটা উগ্র ও হিংস্ররূপ ছাড়া আর কিছু নয়; এবং সে সঙ্কটের অবসান হইতে পারে একমাত্র পৃথিবীব্যাপী সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়া। সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায়। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতায় লেনিনের মত নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকিলেও পৃথিবীর বর্তমান রাষ্ট্রধুরন্ধর ও চিন্তানায়কেরা ইতিমধ্যেই 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গতবারকার যুদ্ধ এবং তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী করিয়া বর্তমান যুদ্ধ যে আমাদের সভ্যতার পক্ষে 'টাইম অফ্ ট্রাবল'-এর* পরিচায়ক সে সম্বন্ধে মনীষীরা প্রায় একমত। রোমক সভ্যতার 'টাইমস্ অফ ট্রাবলের' কথা মনে করিয়া আজ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। নূতন ভিত্তিতে নূতন করিয়া গড়িতে না পারিলে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও সন্দেহ নাই। একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা মনে মনে সকলেই স্বীকার করিতেছেন, যদিও সে বিপ্লব কোন দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে সে সম্বন্ধে সকলে একমত নন। সে যাহাই হোক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা

* কথাটি অধ্যাপক আলর্ন্ড্ জে টয়েনবীর 'ষ্টাডি অফ্ হিষ্ট্রী' হইতে গৃহীত।

যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ও কার্য্যক্রমের গুরুত্ব বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। কারণ প্রত্যেক বৈপ্লবিক পরিবর্তনই ব্যষ্টি এবং সমষ্টির সম্মুখে একটা চরম মূল্য বিচারের—ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ফাইন্যাল ভেল্যু জজ্‌মেণ্ট',—প্রশ্ন উপস্থিত করে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদের সম্মুখে সেই 'চূড়ান্ত মূল্যবিচারের' প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। অতীতের সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনের কোন কোন বিশেষত্বকে আমরা মূল্যবান মনে করি এবং বজায় রাখিতে চাই, এবং ভাবী সমাজেই বা কি নূতনত্বের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই, তাহার উপর এই যুদ্ধে আমাদের মনোভাব কি হইবে উহা নির্ভর করিবে। জাতি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব তাই বহুগুণে বেশী। সে দায়িত্বের পরিমাণ গ্রেট বৃটেন ও ভারতবর্ষের সম্পর্কের গণ্ডীর ভিতর আমাদের সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থের মাপে করিলে চলিবে না। জাতীয়তার সীমার বহু ঊর্দ্ধে মানবসমাজের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সেই সমাজ ও বিশ্ব-ইতিহাসের প্রতি ভারতবাসী আমাদের যে দায়িত্ব আছে তাহার কথাও মনে রাখিতে হইবে। সমষ্টিগতভাবে সে দায়িত্ববোধ হয়ত আমাদের রাজনীতিকে আজও উদ্বুদ্ধ করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে দায়িত্ব যে আমরা এড়াইয়া যাইতে পারিব তাহা নয়। ইতিহাসের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন না করিলে ইতিহাস তাহার প্রতিশোধ নিতে ছাড়িবে না। একটু আগে কাভুর, মাসারিক, পিলসুডস্কীর কথা বলিয়াছি। কাভুরের যুগ বহুদিন হইল শেষ হইয়া গিয়াছে। কাভুরের ইতালী মুসোলিনীর ফাশিজ্‌মের জয়গান করিতেছে। মাসারিকের চেকোশ্লোভাকিয়া, পিলসুডস্কীর পোলাণ্ড উভয়ই নাৎসী জার্ম্মাণীর পদানত। জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে কাভুর, মাসারিক, পিলসুডস্কীর নাম থাকিলেও তাঁহাদের কীর্ত্তি যে অবস্থাবিশেষে কত ক্ষণভঙ্গুর হইতে পারে বর্তমান যুদ্ধ সে প্রমাণ দিয়াছে। বুর্জ্জোয়া জাতীয়-সুবিধাবাদ যে জাতীয়তাবাদের দৃঢ়ভিত্তি নয় একথা যদি আমরা মনে রাখি তাহা হইলে মানবসভ্যতার এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় দায়িত্ব হয়ত আমরা প্রতিপালন করিতে পারিব।

৩

যুদ্ধ সম্পর্কে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাবকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা চলে—পূর্ণ সহযোগিতা, সর্ত্তাধীন সহযোগিতা, অসহযোগিতা এবং বৈপ্লবিক প্রতিরোধ। অবশ্য পূর্ণ সহযোগিতা ঠিক কোনও দলবিশেষের ঘোষিত নীতি নয়। দেশীয় রাজ্যের অধিপতিবৃন্দ বড় বড় জমিদার, ধনিক-বণিক ও কায়েমী-

স্বার্থসম্পন্ন অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত লোক, যাহাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় থাকা না থাকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহারা বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা আদর্শের বালাই না রাখিয়া বৃটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছে। অর্থসম্পদ ইত্যাদির দিক হইতে ইহাদের সাহায্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সংখ্যায় ইহারা নগণ্য এবং জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন যোগ নাই। অবশ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরা যুদ্ধে ভারতবাসীদের সহযোগিতার কথা বলিতে গিয়া যখন 'প্রিন্সেজ অ্যাণ্ড পিপল্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া'র কথা উল্লেখ করেন তখন ইহাদের কথাই তাঁহারা বলেন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতি আদর্শ বা আশা আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুরই প্রতীক ইহারা নহে। কাজেই এক্ষেত্রে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা না করিলেও চলিবে।

সর্ত্তাধীন সহযোগিতা ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান দলের নীতি—লিবরল ফেডারেশন, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ। রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া অল্প বিস্তর তারতম্যের এবং সাম্প্রদায়িক দাবীদাওয়ার কথা বাদ দিলে, এই তিনটি দলের যুদ্ধসম্পর্কিত মতামত ও নীতি মূলত একই। ইহারা সকলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের 'ওয়ার এফর্ট' বা যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘোষিত নীতি মানিয়া লইয়া যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত পূর্ণতম নৈতিক ও ব্যবহারিক সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে (এবং কার্য্যত সহযোগিতা অল্পবিস্তর করিতেছে)। তবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে তাহাদের কয়েকটি দাবী আছে। রাজনৈতিক দিক দিয়া ইহাদের প্রধান দাবী, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে 'ডমিনিয়ন ষ্টেটাস' ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ইহাদের, বিশেষ করিয়া হিন্দু মহাসভার ও মুসলিম লীগের, কতকগুলি উগ্র সাম্প্রদায়িক দাবী আছে। রাজনৈতিক দাবী অপেক্ষাও সাম্প্রদায়িক দাবীর উপর ইহাদের ঝোঁক এবং জোর বেশী। রাজনৈতিক দাবী পূর্ণ না হইলে ইহারা কি করিবে সে সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত ইহারা কিছু বলে নাই; তবে কিছু না করিবার সম্ভাবনাই সমধিক। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাবী পূর্ণ না হইলে হয়ত ইহারা যুদ্ধে সাহায্য করিতে চাহিবে না, হয়ত অসহযোগিতার নীতিই অবলম্বন করিবে। মুসলিম লীগের পক্ষে এ কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। যদিও প্রধানত মুসলিম লীগ চালিত বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী যুদ্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পূর্ণতম সহযোগিতার প্রস্তাব তাঁহাদের নিজেদের আইনসভায় পাশ করাইয়া লইয়াছেন এবং তদনুসারে কাজ করিতেছেন, মুসলিম লীগ সম্প্রতি স্থির করিয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক দাবী সম্পর্কে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পাইলে সরকারী যুদ্ধসমিতিতে যোগদান করিবে

না। অবশ্য বাংলা ও পঞ্জাবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকরী হয় নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাবী পূরণ করা না হইলে যুদ্ধ ব্যাপারে অসহযোগিতা করিবার একটি প্রচ্ছন্ন হুমকী মোটের উপর মুসলিম লীগের তরফ হইতে বৃটিশ সরকারকে দিয়া রাখা হইয়াছে এ কথা বলা চলে।

লিবরল ফেডারেশন, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, এই তিনটি দলের মধ্যেই একটা মূল যোগসূত্র আছে—তাহা শ্রেণীস্বার্থের। এই তিনটি দলই উচ্চশিক্ষিত ধনিক ও উদ্ধতন চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা গঠিত এক মুসলিম লীগ ভিন্ন ইহাদের কাহারও কোনও ব্যাপক ও সুদৃঢ় গণভিত্তি বা গণসমর্থন নাই। মুসলিম জনসাধারণের উপর মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রভাব যথেষ্ট ব্যাপক হইলেও মুসলিম লীগের সংগঠন সম্পূর্ণ ভাবে গণতন্ত্রবিরোধী, ফলে জনসাধারণের দাবীদাওয়া লীগের নীতি বা কার্য্যক্রমকে মোটেই প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। এই দলগুলির শ্রেণীস্বার্থের কথা মনে রাখিলেই ইহাদের রাজনীতির দৌড় ও সাম্প্রদায়িকতার অর্থ বুঝা যাইবে। নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামমূলক কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করা ইহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—যদি না সে দাবী সাম্প্রদায়িক হয় এবং সংগ্রামে প্রতিপক্ষ দেশবাসী না হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ইহাদের নাই—ইচ্ছাও নাই। উচ্চতর কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীর সঙ্ঘের রাজনীতি যেরূপ হওয়া সম্ভব ইহাদের রাজনীতি অবিকল তাহাই। যুদ্ধের সুযোগে যদি কিছু সুবিধা মিলিয়া যায় তাহা লইতে ইহারা মোটেই নারাজ নয়, যদিও কালনেমির লঙ্কাভাগের মত রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্য্যত হাতে আসিবার পূর্ব্বে সম্প্রদায় হিসাবে তাহার চুলচেরা ভাগ বাটোয়ারা করিবার জন্য ইহারা সব সময়ই তৈয়ার আছে। সাম্প্রদায়িকতা ইহাদের মজ্জাগত, কারণ সাম্প্রদায়িক অজুহাত ভিন্ন জনসাধারণের কোনও সমর্থন লাভ করিতে ইহারা অক্ষম। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইহাদের সুবিধাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ফলে ভারতবাসী জনসাধারণ একদিকে 'পাকিস্তান' আর অন্যদিকে 'হিন্দুস্থানের' বিভীষিকা দেখিতেছে।

৪

ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত যুদ্ধনীতিতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই বা আস্থা স্থাপন করে নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে এই যুদ্ধে তাঁহাদের লক্ষ্য হইল

শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে যে ভাবে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহাতে বৃটেনের এ যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ইহার উদ্দেশ্য যে বৃটিশ জাতির কায়েমী সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখা ছাড়া অন্য কিছু নয়, এই ধারণাই কংগ্রেসের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। তাই কংগ্রেস ভারতবাসী জনসাধারণের বিনা সম্মতিতে জোর করিয়া তাহাদের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপাইয়া দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত কোনও রূপ সহযোগিতা করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী গত বৎসর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করিয়াছে এবং এই আটটির মধ্যে সাতটি প্রদেশেই এ পর্য্যন্ত কোন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ফলে এই সমস্ত প্রদেশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

আপাতত কংগ্রেস এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গিয়াছে অর্থাৎ অসহযোগিতা এখন পর্য্যন্ত সক্রিয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় পরিণত হয় নাই। অবশ্য নীতি হিসাবে কংগ্রেস প্রতিরোধের কার্য্যক্রমে বিশ্বাসী। গত দুই দশকের মধ্যে কংগ্রেস অন্ততঃ তিনবার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে, কাজেই কি ঐতিহ্যের দিক দিয়া, কি নীতি ও কর্ম্মকৌশলের দিক দিয়া অসহযোগিতার বর্ত্তমান কার্য্যক্রম অদূর ভবিষ্যতে সক্রিয় যুদ্ধবিরোধিতায় পর্য্যবসিত হইলে তাহা অভূতপূর্ব্ব কিছু হইবে না। এমন কি কংগ্রেসের বিগত রামগড় অধিবেশনেও আইন অমান্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া যুদ্ধবিরোধিতা করাই যে কংগ্রেসের পক্ষে 'লজিক্যাল নেক্সট্ ষ্টেপ', যুক্তিযুক্ত পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম, তাহাও স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে।

৫

সম্পূর্ণভাবে বৈপ্লবিক প্রতিরোধের নীতিতে বিশ্বাসী দলগুলি এদেশের রাজনৈতিক পরিভাষায় বামপন্থী বলিয়া পরিচিত। এক হিসাবে এই দলগুলি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত চরমপন্থী উপদল ছাড়া কিছু নয় এবং কংগ্রেসের বাহিরে নানা দিকে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র থাকিলেও প্রধানত কংগ্রেসের মধ্য দিয়াই ইহাদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃত্ব ইহাদের মতে দক্ষিণপন্থী ; দক্ষিণপন্থীদের তীব্র সমালোচক বা বিরুদ্ধচারী হিসাবে ইহারা বামপন্থী। এই অর্থেই দেশে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী কথা দুইটি

চালু হইয়া গিয়াছে। বামপন্থীদের মধ্যে সকলেই সমাজতন্ত্রবাদ ও মার্ক্সবাদ দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইলেও সকলে এক দলভুক্ত বা সম্পূর্ণভাবে একমতাবলম্বী নয়। দল হিসাবে ভারতবর্ষে কম করিয়া ছয়টি বামপন্থী দল ধরা যায়। এক দিকে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট, ন্যাশনাল ফ্রণ্ট (কম্যুনিষ্ট) ও বামপন্থীরা (অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের অনুবর্ত্তীরা), অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক, লেবার পার্টি ও রেভলিউশ্যনারী সোশ্যালিষ্ট পার্টি (ইঁহারা প্রথমে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট দলে ছিলেন কিন্তু সম্প্রতি উহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া অধিকতর চরমপন্থী 'রেভলিউশ্যনারী সোশ্যালিষ্ট পার্টি' গঠন করিয়াছেন)। বামপন্থীরা সকলে প্রতিরোধের কার্য্যক্রমে বিশ্বাসী হইলেও দক্ষিণপন্থীদের বাদ দিয়া কোনও সংগ্রামাত্মক কার্য্যকলাপ অবলম্বন করা উচিত কিনা, ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। উপরোক্ত দলগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি (কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট, ন্যাশনাল ফ্রণ্ট এবং রায়-পন্থীরা) কংগ্রেস কোনও আন্দোলন আরম্ভ না করিলে নিজেরা কিছু করিতে নারাজ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক, লেবার পার্টি ও রেভলিউশ্যনারী সোশ্যালিষ্টরা আশু যুদ্ধবিরোধিতা ও জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পক্ষপাতী। যুদ্ধ সম্পর্কে ইহাদের সকলের মতামত মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন অনুযায়ী, মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগপদ্ধতি লইয়া এবং চুলচেরা 'ষিওরেটিক্যাল' (তাত্ত্বিক) বিচার লইয়া প্রচুর উন্মাময় তর্ক ঝগড়া ও দলাদলি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে, কিন্তু সমগ্রভাবে বামপন্থী দলগুলি ভারতবর্ষের রাজ-নীতিতে 'হ্যাভ্‌নট্' বা বঞ্চিতদের মুখপাত্র। সে দিক দিয়া কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সহিত ইহাদের যোগাযোগ সমবেত ভাবে অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশী ব্যাপক ও নিবিড়। সে যোগাযোগ এখনও ইহাদেরকে জনসাধারণের চোখে জাতীয় নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করিতে পারে নাই। তবু যুদ্ধের ফলে যদি দেশে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহা হইলে এই দলগুলি যে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদ্যম প্রদর্শন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাতত ইহাদিগকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরাই সঙ্গত, কারণ কংগ্রেস ইহাদের সকলেরই প্রধানতম 'পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম', এবং কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়াই ইহাদের রাজনৈতিক কার্য্যক্রম মুখ্যত গড়িয়া উঠিয়াছে।

৬

রাজনৈতিক দিক দিয়া এক সম্প্রদায়সচেতন মুসলমান জনসাধারণ ভিন্ন দেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ধনিক ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের

উপর—এক কথায় 'মাস' বা জনসাধারণের উপর, কংগ্রেসের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। কংগ্রেস সে হিসাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের মতামত, আদর্শ, নীতি ও কার্য্যক্রমের গুরুত্বও তাই সমগ্র দেশের পক্ষে অনন্যসাধারণ। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অসহযোগিতার নীতি তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিচলিত করিয়াছে। কংগ্রেস সরকারীভাবে যদিও এ কথা ঘোষণা করিয়াছে যে যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিবার কোনও উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নাই, তবুও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করিবার মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোক যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নাই এমন কথা বলা যায় না। তাহা ছাড়া উপরে বলা হইয়াছে, অবিলম্বে 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার পক্ষপাতী বামপন্থী ব্যক্তি ও দলের সংখ্যাও কংগ্রেসের মধ্যে কম নয়। বস্তুত কংগ্রেসের আসরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীর মধ্যে মতভেদ বর্ত্তমানে ইহা লইয়াই। কংগ্রেস এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্বাধীন হইলেও বামপন্থীদের সংগ্রামাভিমুখী আন্দোলন ও সংগ্রামাত্মক কার্য্যকলাপ পরোক্ষভাবে দক্ষিণপন্থীদেরও বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ অন্তত মুখে হইলেও বলেন যে তাঁহারাও সংগ্রাম চান বা সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তাকে যতদূর সম্ভব সংগ্রামাত্মক ছাপ দেওয়ার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র। সাধারণ অনুবর্ত্তিদের উপর প্রভাব বজায় রাখিবার জন্যও তাঁহাদেরকে প্রকাশ্যে সংগ্রামের কথা বলিতে হইতেছে এবং সংগ্রামের পাঁয়তাড়া ভাঁজিতে হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে সত্যাগ্রহ শিবির খুলিয়া কুচকাওয়াজ করিয়া একটা সংগ্রামাত্মক হাওয়া বজায় রাখিতে হইতেছে—যদিও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস কোনও সংগ্রামই এখনও আরম্ভ করে নাই বা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার আপোষরফার বন্দোবস্তের পথও বন্ধ হইয়া যায় নাই। যুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব আপোষরফার অনুকূল বলিয়া স্বয়ং গান্ধীজী ও কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কলম আজাদ মনে করেন। অবশ্য তাহার পূর্ব্বে কংগ্রেসের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে স্বীকৃত হওয়া চাই। এমন কি কোন কোন সর্ত্তে সম্মিলিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের এই প্রস্তাবে করিয়াছেন।

যাহা হোক্, মুসলিম লীগ এবং অ-কংগ্রেসী অন্যান্য দলের সহযোগিতার

নীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জনসাধারণের দিক দিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ ও সংগ্রামাত্মক কার্য্যকলাপ (যাহার সম্ভাবনা নাই বলা চলে না) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যে জাতীয়স্বতন্ত্রতাবোধ জনসাধারণের (এমন কি মুসলিম জনসাধারণেরও) রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে প্রধানত কংগ্রেসই তাহাকে আদর্শ ও সংগঠনের দিক দিয়া রূপ দিয়াছে। জনসাধারণের কাছে কংগ্রেস তাই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, জাতির প্রতিনিধি। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রধানত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের যে জাতীয়তাবোধ ভারতবর্ষে প্রধানত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং জাতীয়তাবোধের ভিতর যে সর্ব্ব-ভারতীয়ত্ব আছে, তাহাদের প্রতীক কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। কংগ্রেস যদি সত্য সত্যই সংগ্রামের পথ নেয় তাহা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে বিশেষ ভাবেই বিব্রত হইবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাজেকাজেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান মনোভাব এবং কর্ম্মপদ্ধতির কিছু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৭

এবারকার যুদ্ধ কংগ্রেসের উপর যে অনেকখানি অতর্কিতে আসিয়া পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আইনঅমান্য আন্দোলন নিবৃত্ত হইবার পর ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস যখন নিয়মতান্ত্রিকতার পথ বাছিয়া লয় তখন হইতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস একটানা সেই পথেই চলিয়া আসিয়াছে। ফলে তাহার সংগঠন, কার্য্যপদ্ধতি এবং আন্দোলনের ধারা নিয়মতান্ত্রিকতার সীমার মধ্যেই এতদিন আবদ্ধ ছিল। অবশ্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের তরফ হইতে বরাবরই বলা হইয়াছে, ইহা জাতীয় আন্দোলনের নূতন অধ্যায়ে সংগ্রামেরই একটা নূতন কৌশল মাত্র। ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচনে নামিয়া পরিষদে প্রবেশ করিলেও ব্যবস্থাপরিষদের বাহিরে জনসাধারণের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। কিন্তু কার্য্যত কংগ্রেস একটা সাধারণ নিয়মতান্ত্রিক 'ইলেক্টোর‍্যাল পার্টি'তেই পরিণত হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আইনঅমান্য আন্দোলনের অসাফল্যের দরুণ জনসাধারণ ও কংগ্রেসের সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে যে নৈরাশ্যের ভাব দেখা গিয়াছিল ১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচনসংগ্রাম এবং বিশেষ করিয়া ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চালু হইবার পর বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনসংগ্রামের মধ্য দিয়া সে নৈরাশ্য বহুল পরিমাণে

দূর হইয়াছিল। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যক্রমের ইহা একটি সত্যকার লাভ। তাহা ছাড়া নির্ব্বাচনী সংগ্রামে কংগ্রেস জনসাধারণের সম্মুখে তাহাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবী যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে তাহাদের শ্রেণী হিসাবে সচেতন হইবার পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে জনসাধারণ কংগ্রেস কর্ত্তৃক আরব্ধ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে নিজেদের অধিকারবোধ যে তাহাদিগকে সংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সে কথা বলা চলে না। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশাকে অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে বিদেশী শাসনের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে শাসনের বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের সত্যকার বিশ্বাস ছিল সে কথা ও বলা চলে না। কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী সংগ্রাম, বিশেষ করিয়া ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার, সর্ব্বপ্রথম কৃষক শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দাবীকে মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের দাবীর সহিত এক পর্য্যায়ে বৃহত্তর জাতীয় দাবীর অংশ হিসাবে তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে জনসাধারণকে শ্রেণীসচেতন করিয়া নূতন পর্য্যায়ে জাতীয় সংগ্রামকে উন্নততর স্তরে তুলিবার ও অধিকতর বিপ্লবমুখী করিবার সাহায্য হয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকতার এই পরোক্ষ ও অযাচিত ফল সম্বন্ধে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সম্যকরূপে সজাগ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এই সময়েই বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত হইয়া ধীরে ধীরে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এবং শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিতে একটু একটু করিয়া উন্নতির সূচনা হওয়ায় কৃষক মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আর্থিক দিক দিয়া কিছুটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার অবসর পায়। এই সব কারণের সম্মিলিত ফল জনতার ভিতর নূতন রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করিতে এবং গণ-আন্দোলনের নূতন ভিত্তি রচনা করিতে সাহায্য করিয়াছে।

এইভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্বের অগোচরে যখন গণ-আন্দোলনের একটা ব্যাপক ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া প্রদেশে প্রদেশে নূতন শাসনতন্ত্র কায়েম করিবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলও জনসাধারণের উপর ভাল ছাড়া খারাপ হয় নাই। নিজেদের চোখের সম্মুখে "কংগ্রেস রাজ" প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাহারা অধিকতর উৎসাহিত এবং আত্মপ্রত্যয়শীলই হইয়াছিল। নিজেদের দাবীগুলি তাহাদেরই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা তাহাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নততর স্তরে লইয়া যাইতেই সাহায্য করিয়াছিল।

জাতীয় আন্দোলনের এই নূতন পর্য্যায়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অকৃতকার্য্যতা বোধ হয় এই যে, তাঁহারা এই নূতন গণচেতনাকে কোনও সুসংগঠিত রূপ দিতে পারেন নাই। ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে কংগ্রেসের ভিতর 'মাস কনট্যাক্ট' বা গণসংযোগ আন্দোলনের একটা উদ্যোগ হয়। শ্রেণীসচেতন কৃষক এবং শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে কি করিয়া কংগ্রেসের ভিতর টানিয়া আনা যায় এবং সংগঠনের দিক দিয়া কংগ্রেসকে কি ভাবে জনতার মধ্যে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেণীগত দাবীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, ইহাই ছিল গণসংযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ সম্পর্কে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। একদিকে দক্ষিণপন্থীদের ঔদাসীন্য ও বিরোধিতা এবং অন্যদিকে বামপন্থীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে গণসংযোগের অর্থ এবং পদ্ধতি লইয়া চুলচেরা তর্কের ফলে কংগ্রেসের গণসংযোগ একটা অর্থহীন বুলি মাত্র হইয়াই রহিল, কংগ্রেসকে সংগঠনের দিক দিয়া শক্তিশালী বা উন্নত করিতে পারিল না। ফলে এক যুক্তপ্রদেশ এবং ওজরাট ভিন্ন কৃষক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসের প্রভাবের বাহিরেই রহিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়; বিহার, অন্ধ্র, পঞ্জাব, সীমান্ত প্রভৃতি প্রদেশে কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মধ্যে প্রবল বিরোধিতা দেখা যাইতে লাগিল। বিহারে তো কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হঠকারিতা এবং অদূরদর্শিতার ফলে কৃষকেরা কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে কৃষকস্বার্থবিরোধী বলিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষিনীতি কৃষক ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান ছাড়া কমাইয়া দেয় নাই। যেখানেই জমিদারের সহিত কৃষকের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল সকল সময়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কৃষকের বিরুদ্ধে। ইহাতে কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেসের মর্য্যাদা যে বৃদ্ধি পায় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

এই যুগে কংগ্রেসের দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক অকৃতকার্য্যতা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া। গত তিন বৎসরে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যকলাপ তাঁহাদের দেশী কায়েমী স্বার্থকে অতিক্রম করার অক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে। এই তিন বৎসরে যেখানেই জমিদার ও ধনিক বণিকের কায়েমী স্বার্থের সহিত কৃষক শ্রমিকের স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়াছে, এবং যেখানেই কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা কায়েমী স্বার্থের অনুকূলেই কাজ করিয়াছেন বা না করিতে পারিলেও যতদূর সম্ভব কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। অবশ্য দু-এক স্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহা নয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগে কানপুরের কাপড়ের

কারখানায় ধর্ম্মঘটের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী মিল-মালিকদের বিরুদ্ধেই গিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ দু-একটি উদাহরণ কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যকলাপের মূল সামাজিক পক্ষপাত কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

৮

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্ত্তমান মনোভাব এবং কার্য্যক্রমের তাৎপর্য্য ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে কংগ্রেসের এই ত্রুটী এবং অকৃতকার্য্যতাগুলি সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার। এই অকৃতকার্য্যতা কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃত্বের সামাজিক শ্রেণীরূপ এবং শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বুঝিতে আমাদের সাহায্য করিবে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ধনিক ও শিক্ষিত শ্রেণীর হাতেই আছে। গত কয় বৎসরের ভিতর কংগ্রেসের গণভিত্তি ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বের শ্রেণীরূপ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষের ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আপাতত বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হইলেও ইহাদের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার প্রধান মিত্র দেশীয় নৃপতিবৃন্দ, ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়, এবং উচ্চস্তরের ধনিক বণিকদের আর্থিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত যোগাযোগ অত্যন্ত বেশী ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। শেষ পর্য্যন্ত সম্মিলিত বিদেশী ও দেশী কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র রচনা করা (যাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের সমগোত্রীয় ইংরাজ এবং ফরাসী মধ্যবিত্ত ও ধনিক সম্প্রদায় করিয়াছিল) ইহাদের পক্ষে কার্য্যত একেবারেই অসম্ভব। স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্ররচনার অর্থাৎ আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের আছে কিন্তু ক্ষমতা নাই। তাই ইহাদের রাজনীতি যদিও আপাতত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সে বিরোধকে উহার স্বাভাবিক চরম পরিণতি পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ পর্য্যন্ত যাইতে—তাহারা সাহস করে না। সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ দিয়া যতদূর পারা যায় রাষ্ট্রিক এবং নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করাই ইহাদের আন্দোলনের লক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদের উপর চাপ দিয়া সফল হইতে হইলে এবং কিছু কিছু সুবিধা আদায় করিতে হইলে গণসমর্থন প্রয়োজন, সেই জন্য তাহারা মধ্যে মধ্যে গণআন্দোলন করে। কিন্তু সে আন্দোলন যাহাতে বিপ্লবমুখী না হয় তাহার জন্য আদর্শবাদ ও পদ্ধতির দিক দিয়া এমন নীতিই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে জনতা কিছুতেই যেন তাহাদের

(ধনিক মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতশ্রেণীজাত নেতাদের) শ্রেণীস্বার্থ অতিক্রম না করিতে পারে। গান্ধীবাদ এই শ্রেণীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মতবাদ (যদিও সর্ব্বাংশে নয়) এবং মহাত্মা গান্ধী ইহাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। * ইহাদের নেতৃত্বে তিন তিন বার জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের উপর ইহাদের প্রভাব এখনও প্রভূত। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর যে আংশিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইহারা হাতে পাইয়াছিল তাহার ব্যাবহারিক প্রয়োগের ফলে জনসাধারণের সহিত ইহাদের ব্যবধান অত্যন্ত বেশীরকম বাড়িয়া গেলেও এখনও কোন নির্ভরযোগ্য নূতন নেতৃত্ব গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া জনসাধারণ পূর্ব্ব অভ্যাসবশত আজও ইহাদের কথাই মানিয়া চলে, তবে আর কতদিন যে চলিবে তাহা বলা কঠিন।

নিয়মতান্ত্রিকতার যুগে কংগ্রেস তাহার গণভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তাহার সংগঠনকে শক্তিশালী ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এবং শ্রেণীস্বার্থের প্ররোচনা তাহাকে সে সুযোগ গ্রহণ করিতে দেয় নাই। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে কংগ্রেসের এত বড় অকৃতকার্য্যতা আর দেখা যায় নাই। † এই সঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে। ১৯৩৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া নিয়মতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইলেও মুখে নেতৃবৃন্দ সকল সময়েই সংগ্রামের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রস্তাবিত ফেডারেশ্যনের প্রবর্ত্তন হইলেই তাঁহারা যে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবেন এই রকম একটা কথা তাঁহারা বরাবর জনসাধারণকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে সাময়িক ভাবে তাঁহাদের দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে—প্রথমত, অনিশ্চিত হইলেও অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণসংগ্রামের সম্ভাবনা আছে

* লেখক এই স্থলে মহাত্মাজীর কর্ম্ম ও নীতির একটি দিক দেখিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। অবশ্য কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালনা সমিতির ভিতর দিয়া মহাত্মাজীর কার্য্যকলাপ যে ভাবে প্রকাশ পাইতেছে সে সম্বন্ধে লেখকের উক্তি বহুলাংশে সত্য বলা চলে, কিন্তু তাহার বাহিরে ব্যক্তি হিসাবে মহাত্মাজীর সহিত আধুনিক ভারতীয় ইন্‌টেলিজেন্টসিয়ার (তা সে বুর্জোয়াই হউক আর কম্যুনিষ্টই হউক), কোন যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না।— সম্পাদক, সমসাময়িক।

† এ পর্য্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্য্যায়ে কংগ্রেস জনসাধারণের দাবীদাওয়ার তাগিদ এবং আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতাও সেই সঙ্গে বাড়িয়াই চলিতেছিল। ১৯৩৪-৩৯ সাল হইতে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইবার সেই ক্ষমতার অভাব দেখা গেল।

এই অজুহাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের শ্রেণীগত আর্থিক ও অন্যান্য দাবীর তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, সংগ্রামের বুলি আওড়াইয়া কংগ্রেসের তদানীন্তন নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যক্রমকে একটা সংগ্রামাত্মক ছাপ দিয়া বামপন্থীদের সমালোচনার হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ অনুবর্ত্তিদের উপর রাজনৈতিক এবং আদর্শগত প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব হইতেছিল। ফেডারেশ্যন প্রবর্ত্তিত হইলে সত্যসত্যই সংগ্রাম হইত কি না সে তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই। কারণ যুদ্ধের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টই আপনা হইতেই ফেডারেশ্যন স্থগিত রাখিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনও ব্যাপক গণসংগ্রাম আরম্ভ করার মত সংগঠন এবং উদ্যোগ আয়োজন যে ছিল না তাহা সুনিশ্চিত। ফলে জনসাধারণের ভিতর সংগ্রামের অনুকূলে একটা তীব্র অথচ অবাস্তব মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মনোভাব বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ভাবেই বিব্রত ও চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

৯

এই অবস্থায় ইউরোপে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল। সহসা দানৎসিগ্ ও পোলিশ করিডর উপলক্ষ্য করিয়া এক দিকে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স এবং অন্যদিকে জার্ম্মানীর মধ্যে সংঘর্ষের ভিতর দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সূচনা হইয়া গেল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধসঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির গতি লক্ষ্য করিয়া হরিপুরা অধিবেশনের সময় হইতেই কংগ্রেসের প্রত্যেক বাৎসরিক অধিবেশনে, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যুদ্ধ যে আসন্ন সে কথা তাঁহারা বলিয়া আসিতেছিলেন। ভারতবাসীর বিনা সম্মতিতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে ভারতবর্ষের উপর যুদ্ধের বোঝা চাপাইয়া দিলে কংগ্রেস যে তাহার সর্ব্ববিধ বিরোধিতা করিবে সে কথাও হরিপুরাতে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের হরিপুরা প্রস্তাবের মর্ম্মই ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম। কিন্তু এত শীঘ্র ও এমন অতর্কিতে যে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইবে সে কথা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই মহাত্মা গান্ধী বৃটেন ও ফ্রান্সের অনুকূলে তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়া যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে কংগ্রেসের পক্ষে বিনা সর্ত্তে বৃটেনকে সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কিন্তু এই মত গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। তাঁহারা দাবী করিলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া যে নীতি বা লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন অবিলম্বে তাহার প্রয়োগ ভারতবর্ষেও করিতে হইবে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীন রাষ্ট্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং গণপরিষদের ভিতর দিয়া তাহার স্বীয় গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেসের মতে ইহাতেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের গণতন্ত্র-সম্বন্ধে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং একমাত্র এই সর্ত্তেই কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করিতে পারে। অবশ্য ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হইলে, কংগ্রেস আপাতত—অর্থাৎ যুদ্ধ যতদিন চলিবে সেই সময়ের মধ্যে, শাসনব্যবস্থার সম্ভব রকমের রদবদলেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তরফ হইতে এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিরতির পর ডমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের আশা দেওয়া ও বর্ত্তমানে বড়লাটের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া অতিরিক্ত কিছু করিতে নারাজ। বলা বাহুল্য কংগ্রেস ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই এবং সেই জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করিবে বলিয়া মনে করিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসে বিগত রামগড় অধিবেশনে আইনঅমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার হুমকীও দেখান হইয়াছে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তরফ হইতে কোনও সংগ্রাম সত্যসত্যই আরম্ভ হইবে কিনা সে প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কোন সংগ্রাম যে আরম্ভ হয় নাই বর্ত্তমানে সেইটাই সত্য। যুদ্ধসঙ্কট যে ভাবে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে তাহাতে যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়াই হোক বা অন্য যে কোনও উপলক্ষ্যেই হোক বৃটেনের বিরুদ্ধে কোনও জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার অর্থই যুদ্ধে বৃটিশবিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়া। অন্তত বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ সময়ে সাম্রাজ্যের ভিতর কোনও আভ্যন্তরীণ গোলযোগকে সেই চোখেই দেখিবে। সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চিরদিনের মত বোঝাপড়া করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, মনে মনে কোনও সংগ্রাম না চাহিলেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহার বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। এ সম্পর্কে লর্ড ক্রোমারের কথাই হয়ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শেষ কথা :—

"It will be well for England, better for India and best for all cause of progressive civilisation, if it be clearly understood from the outset that however liberal the concessions we have made we have not the slightest intention of abandoning our Indian 'possessions'."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের বাধ্যবাধকতা, কংগ্রেস সংগঠনের বর্তমান অবস্থা, জনসাধারণের উপর নেতৃবৃন্দের প্রভাব, শ্রেণী-সচেতন কৃষক শ্রমিকের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ-সংঘাতের আশঙ্কা ইত্যাদির কথা মনে রাখিলে কোনও চরম সংগ্রামের জন্য যে তাঁহারা প্রস্তুত নন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথচ বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অন্য যে কার্যক্রম অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল—অর্থাৎ বৃটেনের সহিত সহযোগিতার পথে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই সহযোগিতা এবং শক্তির দাবীতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আদায় করা—তাহাও অবলম্বন করিতে তাঁহারা পারেন নাই। কারণ গত ছয় বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সাধারণ অনুবর্ত্তী এবং জনসাধারণের ভিতর যে কৃত্রিম মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রভাব তাঁহারা নিজেরাও এড়াইতে পারেন নাই। 'র‍্যাঙ্ক অ্যাণ্ড ফাইল'-এর উপর রাজনৈতিক প্রভাব হারাইবার ভয়ে এবং সম্ভ্রম হানি হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা প্রকাশ্য সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং আজও পারিতেছেন না। সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভিতর যে মতভেদ প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহার মূল কারণই এইখানে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আজ বৃটেনের সহিত সর্ত্তাধীনে সহযোগিতা করিতে রাজী। ওয়ার্কিং কমিটির বিগত দিল্লী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে প্রকারান্তরে সে আভাষও দেওয়া হইয়াছে। সহযোগিতা, অসহযোগিতা ও প্রতিরোধ এই তিন নীতির মধ্যে কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। কার্য্যত এখন পর্য্যন্ত অসহযোগিতার নীতির কোনও ব্যত্যয় হয় নাই বটে কিন্তু পূর্ণ অসহযোগিতা এবং সর্ত্তাধীন সহযোগিতার মধ্যে ব্যবধান খুব অল্প। সে ব্যবধান ঘুচিয়া যাওয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, অন্যদিকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বামপন্থীদের তারস্বরে চীৎকার সত্ত্বেও বৈপ্লবিক প্রতিরোধের নীতি কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। কংগ্রেসের সংগঠন, নেতৃবৃন্দের মনোবৃত্তি, আয়োজন উদ্যোগ কিছুই বর্ত্তমানে চরম সংগ্রামমূলক কোনও কার্যক্রম অবলম্বন করার অনুকূল নয়।

৯০

আমাদের রাজনৈতিক বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের প্রায় এক বৎসর ইতিমধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ আপাতত শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে পোল্যাণ্ড হইতে সুরু করিয়া উত্তরে নরওয়ে এবং পশ্চিমে ফ্রান্স পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র য়ুরোপ আজ নাৎসী জার্ম্মানীর পদানত। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের মধ্য দিয়া নাৎসী বাহিনীর প্রচণ্ড গতি রোধ করিতে না পারিয়া ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত ভিক্ষা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধানতম শক্তি রুশিয়া জার্ম্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ, তুরস্ক ও অন্যান্য দু-একটি দেশ ভিন্ন অন্য সকলে হয় জার্ম্মানীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, আর না হয় কোনও মতে জার্ম্মানীর কৃপায় বাঁচিয়া আছে মাত্র। ইটালী জার্ম্মানীর পক্ষভুক্ত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। জার্ম্মানীর অগ্রগতি রোধ করিতে একা গ্রেট বৃটেন ভিন্ন য়ুরোপে আর কেহ নাই। নাৎসী ষ্টীম রোলারের দুর্ব্বার বেগ পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেলের তটদেশে আসিয়া সাময়িকভাবে নিরস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু ইতিমধ্যে ইটালীর যুদ্ধে যোগদান করার ফলে ভূমধ্য-সাগর আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ঢেউ সুয়েজ পার হইয়া আসিয়া আরব্য উপসাগরের পশ্চিম উপকূলকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে, সে ঢেউ ভারতবর্ষের তটদেশকেও যে আন্দোলিত করিবে না সে কথা একেবারে বলা যায় না।

এদিকে সুদূর প্রাচ্যে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের ফলে ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ্ ও ফরাসী ইন্দোচীনকে ঘিরিয়া জাপান ও মার্কিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ্যে ও গোপনে যে তীব্র আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগরেও যুদ্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা সৃষ্টি হইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে যুদ্ধ য়ুরোপ ভূখণ্ডেই আবদ্ধ নাই, তাহা দ্রুতবেগে সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। ভৌগোলিক দূরত্ব বেশী দিন ভারতবর্ষকে সে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যিক স্বার্থসংঘাত ও আন্তর্জাতিক কূটনীতি নেপথ্যে অতি দ্রুতবেগে সুদূর ও নিকট প্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য নূতন অঙ্কপট রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষই হয়ত তাহার কেন্দ্ররূপে দেখা দিবে। তখন আমাদের রাজনীতি আবার কি আকার ধারণ করিবে তাহা এখন বলা যায় না।

এক বামপন্থীদের বাদ দিলে সমগ্রভাবে আমাদের রাজনীতি বুর্জোয়া সুবিধাবাদের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই; তাহা আজও কাভুর মাসারিকের রাজনীতির অক্ষম ভারতীয় সংস্করণ হইয়াই রহিয়াছে। যখন ভারতবর্ষের পক্ষে

যুদ্ধ আর প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের পাঠ্য বিষয় ও জল্পনার বস্তু হইয়া থাকিবে না, ধ্বংস ও মৃত্যুর ভয়াবহ বাস্তবরূপ লইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার আবির্ভাব ঘটিবে, তখন এই সুবিধাবাদের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইবে তাহা হয়ত আন্দাজ করা যায়। বামপন্থীরা আমাদের দেশে বিপ্লববাদের প্রতিনিধি —কিন্তু যুদ্ধের মুখামুখি দাঁড়াইয়া তাহার বিরোধিতা করা আর যুদ্ধক্ষেত্রের বহুদূর হইতে যুদ্ধবিরোধিতার পিওরী লইয়া চুলচেরা তর্কবিতর্ক করার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের বামপন্থীরা সে প্রভেদ সম্বন্ধে সচেতন কিনা কে জানে?

আমাদের সম্মুখে—এবং কেবল আমাদের সম্মুখেই নয়, সমগ্র সভ্যতার সম্মুখে —যুদ্ধ একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইলেও অনির্দ্দিষ্ট নয়। যুদ্ধসঙ্কটের ভিতর দিয়া আমরা যে পথে যে ভাবে অগ্রসর হইব তাহার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। রাজনীতি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার একটা মুখ্য উপায়। তাহা কেবল ইংরাজের নিকট হইতে শাসনসংস্কার আদায় করিবার কৌশল মাত্র নয়। আজিকার যুগ-সন্ধিক্ষণে যখন সমস্ত দেশের, সমস্ত জাতির, সমগ্র মানবসমাজের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইতে চলিয়াছে তখন আমাদের দায়িত্বের পরিমাণ সাধারণ জাতিগত স্বার্থের মাপকাটিতে করিলে চলিবে না। আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সমগ্র মানবজাতির ও সমস্ত বিশ্বইতিহাসের প্রতি, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। স্পেঙ্গলারের কথায় বলিতে গেলে, "World history is the world court"—বিশ্ব ইতিহাস বিশ্বের বিচারশালা। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—"For us, whom a Destiny has placed in this Culture and at this moment of its development····· our direction, willed and obligatory at once, is set for us within narrow limits, and on any other terms life is not worth the living. We have not the freedom to reach to this or to that, but the freedom to do the necessary or to do nothing. And the task that historic necessity has set will be accomplished with the individual or against him"—জাতিসমষ্টির পক্ষেও এ কথা বলা চলে, "it will be accomplished with the nation or against the nation."

"Ducunt Fata volentem, nolentem trahunt"

(Spengler)

আমাদের জাতীয় রাজনীতির শেষ মাপকাটি ইহাই।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে

"একেলা"

একটা নিতান্ত ব্যক্তিগত সখের কথা বলিতে যাইতেছি। ইহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কল্পনা নাই, তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য নাই, রুচিসংস্কারের সাহস নাই—এক কথায় 'ইডিওলজী'র নামগন্ধও নাই। তবে কোনও অভিসন্ধিই নাই এ কথা বলিতে পারি না। চার ফেলিয়া লোকে মাছ ধরে। আমারও মনে একটা আশা আছে হয়ত বা এই প্রবন্ধরূপ চার ফেলিয়া এক আধ জন সম-খেয়ালীকে গাঁথিয়া তুলিতে পারিব।

আমার যাত্রা সুরু হইল

আমি ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে ঠিক্ কোন জায়গাটি হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম তাহা বুঝাইতে হইলে পাঠকদিগকে আজকালকার ফ্যাশান একটু ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অনেকে (বিশেষ করিয়া যুবকযুবতীরা) ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে উৎসুক হইয়াছেন। আমার ওদিকে ঝোঁক আছে শুনিলে কেহ কেহ হাসিমুখে এ বিষয়ে নিজেদেরও 'দরদ' আছে স্বীকার করেন, লাইট হাউস ও মেট্রো সিনেমায় শ্রুত ভিন্ন দেশী সুরগুঞ্জন করেন; কেহ জিজ্ঞাসা করেন, হাওয়াইয়ান গীটারের বাদ্য আমার কাছে আছে কি-না; এমন কি কেহ বা ক্রাইস্‌লারের বেহালা ও পাডেরেভস্কির পিয়ানো বাজনার রেকর্ড সম্বন্ধেও খোঁজ করেন। যদিও ঠিক এই পথে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে বাহির হই নাই, তবু এই কথাটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে যে, আমাদের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ভাষা, খেলাধূলা, পোষাকপরিচ্ছদ ইত্যাদির মত আমাদের গানবাজনাতেও এত দিন পরে বিদেশী হাওয়া লাগিতে সুরু হইয়াছে। ইহার ফল একেবারে যুগান্তকারী বা প্রলয়ঙ্করী না হইলেও কিছু নিশ্চয়ই হইবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাংলা ভাষাকে ইঙ্গকৃত করা সমাপ্ত করিয়া এই ব্যাপারেও অগ্রণী হইয়াছেন মনে হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহারা রেকর্ডে বন্দে মাতরম গানের যে অর্কেষ্ট্রেল-সঙ্গতি-অসঙ্গতি-সঙ্কলিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয়, আমরা কালক্রমে বেজিক ইংরেজী ভাষা ও বেজিক ইংরেজী

পোষাক (অর্থাৎ হাফ শার্ট ও প্যাণ্ট) ও অন্যান্য বেজিক ইংরেজী হালচালের মত একটা বেজিক ইংরেজী সঙ্গীতও হয়ত আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিব।

কিন্তু যে সময়ে আমি স্কুলে কলেজে পড়ি তখন ইউরোপীয় "সঙ্গীতের এই ল, সা, ও-টুকুও আমাদের কাণে আসিয়া পৌছে নাই। মনেও আসিয়া পৌছে নাই বলিলাম না এই জন্য যে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিবার বিষম প্রয়াসে 'মুনলাইট সোনাটা' ও 'নাইন্থ সিম্ফনী'র নাম শুনিয়াছিলাম, টলষ্টয়ের উপন্যাস 'ক্রয়েটসার সোনাটা' পড়িয়া উক্ত 'সোনাটা' সম্বন্ধে অসম্ভব রকম ভুল ধারণা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম, আর রমেঁ রলাঁর 'জন ক্রিষ্টফার' পড়িতে গিয়া যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাকে বাঁশবনে ডোম কানা বলিলেই চলে। ফল যে অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল তাহা বোধ করি বলা নিষ্প্রয়োজন। নিজের ও সমপাঠীদের এই অগ্নিমান্দ্যের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি ও একটি মিশনারী পরিচালিত হষ্টেলে থাকি। আমাদের সুপারিণ্টেনডেণ্ট এক 'ফাদার'। তাঁহার একটি পিতলের বাঁশী ছিল, যেমন পিতলের বাঁশী সকলের হাতেই দেখা যায়। 'ফাদার' মাঝে মাঝে এই বাঁশীতে দু-চারিটি ফুঁ দিতেন, বিশেষ কিছু বাজাইতেন না। আমরা সম্ভবত উহাকেই ইউরোপীয় সঙ্গীত মনে করিতাম। গল্প আছে (সত্য গল্পই বোধ হয়) পারস্যের কোনও ভূতপূর্ব্ব শাহ ইউরোপে একটা অতি উচ্চাঙ্গের কনসার্ট শুনিতে গিয়াছিলেন। বাজনা শেষ হইবার পর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল কোন জিনিষটি তাঁহার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে তখন তিনি উত্তর দিলেন—লাঠি ভাঁজে যে লোকটা সে (অর্থাৎ কণ্ডাক্টর) আসিবার পূর্ব্বে যে গৎটা বাজান হইয়াছিল (অর্থাৎ বেহালা প্রভৃতির টুং টুং করিয়া সুর বাঁধা) উহাই তাঁহার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে।

আমরাও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে পারস্যের শাহের মতই সমঝদার ছিলাম। তাই 'ফাদারে'র বাঁশী বাজান আমাদের ভালই লাগিত। এক দিন সাহেব বাঁশীতে কয়েকটি ফুঁ দিয়া রাখিয়া দিবার পর আমাদের এক সহপাঠী তাঁহার কাছে গিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "Father, now please play the Moonlight Sonata." সাহেব ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "Oh! Oh! Pankaj knows something about European music!" পরেই, যুবক অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "My boy, the Moonlight Sonata is a very difficult piece of pianoforte music." (অপ্রাসঙ্গিক হইলে এখানে বলিয়া রাখি, পিয়ানোর বনিয়াদী নাম

যে 'পিয়েনো' নয়, 'পিয়ানো' নয়, 'পিয়ানোফর্টে' এই প্রথম শুনিলাম, এবং বলাই বাহুল্য সরলপ্রাণ সমপাঠীদের ঘায়েল করিবার অস্ত্র হিসাবে মস্তিষ্কের তূণের ভিতর সযত্নে গুঁজিয়া রাখিলাম।)

আর একটি জনপ্রবাদও কাণে আসিয়া পৌছিয়াছে। শুনিয়াছি আমাদের সমকালীন কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক নাকি একটি উপন্যাসে নায়িকাকে দিয়া বসিবার ঘরে পিয়ানোতে 'নাইন্থ সিম্ফনী' বাজাইয়া ছাড়িয়াছেন।

আমাদের পুঁথিগত বিদ্যাতেই যখন এই বিপর্য্যয় তখন শ্রুতিগত অভিজ্ঞতায় ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেশ যে কি সুরে বাজিত তাহা না বলাই উচিত। এই অবস্থায় অনেক বৎসর কাটিয়াছিল। এমন সময় ১৯৩০ সনের একটি দিনে কলেজ স্কোয়ারের একটি সুপরিচিত বই-এর দোকানে দৈবক্রমে নূতন জগতের সন্ধান মিলিয়া গেল—incipit vita nuova!

যাঁহারা অসহায়ের সহায় হইয়াছেন

সেই দোকানে ঢুকিয়া দেখি কাউণ্টারের উপর একটি পোর্টেবল্ গ্রামোফোন ও তিনটি রেকর্ডের অ্যালবাম্। কাছে দোকানের স্বত্বাধিকারীর ভ্রাতা আমার বন্ধু দাঁড়াইয়া। এই বন্ধু আজ আর ইহজগতে নাই, কিন্তু কলিকাতার পাঠানুরাগী সমাজ বহুদিন তাঁহার অমায়িকতা, সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধি ও মার্জ্জিত রুচির কথা মনে রাখিবে। প্রথমে জিনিষগুলির প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দিই নাই, কারণ নিকটেই একটি অল্পবয়স্ক ডাক্তার বসিয়াছিলেন। তিনি বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর ডাক্তার, বিলাতী হাবভাবের বিশেষ অনুরক্ত। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনিই আর একটা বিলাতী ঢং আমদানী করিয়াছেন। তাই সোজা দোকানের পিছন দিকে গিয়া শেল্ফ হইতে নূতন বই নামাইয়া দেখিতে লাগিলাম। ওদিকে গান আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ কাণে আসিবার পর মনে হইল নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় যেন নয়। কৌতূহলী হইয়া আগাইয়া গেলাম। শুনিতে লাগিলাম, এবং শেষ হইলে গানের নাম দেখিতে লাগিলাম। যে গানটি সর্ব্বপ্রথমে মনে ছাপ দিয়াছিল উহার রচয়িতা কে তাহা আর মনে নাই, কিন্তু উহার প্রথম চরণ ছিল এই, "Obéissons quand leurs voix apellent, (তাৎপর্য্য—তাহাদের ডাকে যেন আমরা সাড়া দিই), আমেলিতা গাল্লিকুচ্চির গাওয়া। ইহার পরই রিমস্কি-কর্সাকফের রচিত এবং আলমা গ্লুক কিংবা লুক্রেৎসিয়া বোরির গাওয়া "সঙ্গ অফ দি সেপার্ড দি অফ্ লে" ভারী ভাল লাগিয়া

গেল। রেকর্ডগুলির মধ্যে যেন ফ্রিডা হেম্পেল ও এলেনা গেরহার্টের গাওয়া কয়েকটি গানও ছিল, শালিয়াপিন এবং ক্লারা বাট ছিল, দুই একটা জার্মাণ লোকসঙ্গীত (ফোক সঙ্গ) ছিল।

দুই এক দিনের মধ্যে নেশা ধরিয়া গেল—গানের সুরের নয়, গলার মাধুর্য্যের। বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলাম যে, ইউরোপীয় গায়কদের গলা সারমেয়ের ও ইউরোপীয় গায়িকার গলা শৃগালের কণ্ঠের স্মারক। এই কিংবদন্তী নিতান্তই অপবাদ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু দুই একটি গানে ভিন্ন অন্যত্র সঙ্গতি কিছুতেই পাই না, সম্পূর্ণ গানটি জমিয়া উঠে না, মনে হয় যখন পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত তখন পুনরাবৃত্তি হইতেছে না; আস্থায়ীর পর যেখানে অন্তরা আসা উচিত সেখানে প্রত্যাশিত জিনিষ আসিতেছে না, মোটের উপর মহা এলোমেলো ব্যাপার। ভাবিলাম ভুল পথে হয়ত চলিয়াছি, ব্রামস্ শুবার্টের রস উপভোগ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া যাহা গোড়ায় ভাল লাগিয়াছিল তাহারই অনুসরণ করি। ধারণা জন্মিল রিমস্কি-কর্সাকফ ভাল লাগিয়াছে নিশ্চয়ই প্রাচ্য সুরের ছোঁয়াচ আছে বলিয়া, সুতরাং রিমস্কি-কর্সাকফই আরও ভাল করিয়া শুনিতে হইবে। যখন দেখা গেল তাঁহার একটি গানের নাম "Chanson Hindoue" (হিন্দু গান) তখন আরও আশা হইল। কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ নাই, উক্ত গান স্বকর্ণে শুনিবার পর পাশ্চাত্য সঙ্গীতস্রষ্টার রচিত 'হিন্দুত্ব' হইতে সবেগে পলায়ন করিয়া জার্ম্মাণ লোকসঙ্গীতে ফিরিয়া গেলাম।

আমার বন্ধু কৌতূহলের বশে কোনও বিলাতফেরৎ বন্ধুর কাছ হইতে রেকর্ডগুলি ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার কৌতূহল শীঘ্রই মিটিয়া গেল। যখন আমি কোন গানটা সব চেয়ে বেশী ভাল লাগিয়াছে এই প্রশ্নের উত্তেজিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম, তখন বন্ধু বলিতেন, "আমি চেষ্টা করি কোন গানটা সবচেয়ে কম খারাপ লাগিয়াছে শুধু তাহা বুঝিতে।" তবু তিনি আমার খাতিরে রেকর্ড ধার করিবার জন্য মোটা চাদর গায়ে দিয়া শুধু পায়ে কলিকাতার রাস্তায় বহু হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। কিন্তু পরের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া কতদিন এই সখ চালান যায়? তাই কিছুকাল পরে আমার ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় ছেদ পড়িয়া গেল। তবে ভবিষ্যতের আশা ছাড়িলাম না। তরুণ হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আমেজের পর যেমন পাত্রপাত্রী নির্ব্বিশেষে শুধু প্রেমের জন্যই প্রাণ উন্মুখ হইয়া থাকে তেমনই ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা টান রহিয়া গেল।

বৎসর খানেক পরে অবস্থাচক্রে এই চক্ষুর ক্ষুধাকে আসল জিনিষে পরিণত করিবার সুযোগ মিলিল। সে এক ইংরেজ বন্ধুর সহায়তায়। বিলাত যাইবার

সময় তিনি তাঁহার গ্রামোফোনটি, কয়েক শত রেকর্ড ও ফিলহার্মনিয়া সংস্করণের কতকগুলি স্বরলিপির বই আমার কাছে রাখিয়া গেলেন। দুই বাক্স চেম্বার মিউজিক, প্রধানত ষ্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেট,—শুবার্টের ১নং পিয়ানো ট্রিয়োটিও ইহার মধ্যে ছিল; এক বাক্স সিম্ফনী; এক বাক্স অপেরার গান ও অন্য বাজনা ইত্যাদি। যেখানে হাত দিই সেখান হইতেই হাইডন, মোৎসার্ট, বেটোভেন, শুবার্ট, ভাগনার উঠিয়া আসে। একেবারে নির্ভেজাল খানদানী ব্যাপার, কোথাও একটুকু ভেজাল নাই। সুতরাং মহোৎসাহে পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কিন্তু গুরুতর বাধাও যে ছিল না তা নয়। কেবল মাত্র রেকর্ড ও স্বরলিপি জোগাড় হইলেই হয় না, বুঝাইয়া দিবার লোক দরকার। তাহার সন্ধানমাত্রও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া লাইব্রেরীতে গ্রোভস-এর 'ডিক্‌সনারী অফ মিউজিক' ও 'অক্সফোর্ড হিষ্টরী অফ মিউজিক' এর শরণাপন্ন হইলাম; বিশেষ সুবিধা হইল না। এমন কি মরিয়া হইয়া গ্রামোফনে রেকর্ড চড়াইয়া স্বরলিপি কোলে রাখিয়া ডেঁয়ো পিপীলিকার সারির মত মিনিম, ক্রচেট, কোয়েভার, সেমি-কোয়েভার, ডেমি-সেমি-কোয়েভার প্রভৃতির উপর দাগা বুলাইতে লাগিলাম। স্বরলিপি যেখানে আরম্ভ রেকর্ডও সেইখানেই আরম্ভ সুতরাং গোড়াটা সনাক্ত করিতে কষ্ট হইত না; আমার বন্ধু নিজের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি রেকর্ডের একটা পিঠ যেখানে শেষ হইয়াছে স্বরলিপির সেই 'বারে' পেন্সিলে ঢেঁড়া কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সেদিকটা সনাক্ত করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু গোল বাধিল মাঝের অংশ লইয়া—যখন ভাবি 'এক্সপজিশ্যন' শুনিতেছি তখন হয়ত বাজিতেছে 'ডেভেলাপমেণ্ট'; যখন ভাবি 'ডেভেলাপমেণ্ট' শুনিতেছি তখন হয়ত বাজিতেছে 'এক্সপজিশ্যন'; আঙুল স্বরলিপির উপরে নিজস্ব চালে ও তালে চলিতে থাকে, বাজনার সঙ্গে কিছুতেই চলে না।

হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে পার্সি স্কোলস্ তাঁহার 'লিসনার্স গাইড টু মিউজিক' পুস্তকের ভিতর দিয়া গুরুরূপে আবির্ভূত হইলেন। শুনিয়াছি বিলাতে সহস্র সহস্র নরনারীকে 'ক্লাসিক্যাল' সঙ্গীতের অনুরাগী তিনি করিয়াছেন। বিলাতের নরনারীর এ-বিষয়ে কতটুকু সহায়তার প্রয়োজন ছিল জানি না, তবে তিনি আমাকে হাত ধরিয়া গভীর জল হইতে তুলিলেন বলিতে পারি। 'লিস্‌নার্স গাইড' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ যে ডোনাল্ড ফ্রান্সিস টোভী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছি (বুঝিতে পারিতেছি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে) তাহা একমাত্র পার্সি স্কোলসের কৃপায়।

আর যাঁহারা সাহায্য করেন নাই

এইবারে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাই নাই তাঁহাদের কথা একটু বলিব। মানুষ স্বচরিত্র, বিশেষ করিয়া স্বকীয় খেয়াল, অন্যে আরোপ করে। ভাই-বন্ধু স্ত্রীপুত্র সকলেই সাক্ষী দিবেন আমার বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু দস্যু রত্নাকর পিতামাতা স্ত্রীপুত্রের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিল, জুডাস চীফ প্রীষ্টদের নিকট হইতে যে উত্তর পাইয়াছিল আমার ভাগ্যে এক শিশু পুত্র ছাড়া অন্যের কাছ হইতে উহা হইতে ভিন্ন উত্তর জুটে নাই। অর্থাৎ সকলেই বলিয়াছেন,—তোমার পাপের ভার তুমিই বহন কর। ইঁহাদের মধ্যে সহধর্ম্মিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি সকল কর্ম্মে ও চিন্তায় সহচারিণী হইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াও সত্যপালনে আমার আদর্শ মত উৎসাহ দেখান নাই। আমি যতবারই সদারধর্ম্ম আচরণ করিতে চাহিয়াছি ততবারই তিনি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য এই বাক্য আওড়াইয়া গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রবোধ দিবেন, ইহা কোন বিশেষ স্বামীর বিশেষ পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়—ইহা শাশ্বত স্বামীর অভিযোগ শাশ্বত পত্নীর বিরুদ্ধে। কথাটার যাথার্থ্য স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। কারণ সেদিনও একটি বিবরণ পড়িয়াছি, যাহা হইতে মনে হয় এই অভিযোগ কোন বিশেষ দেশকালপাত্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। একটি বিলাতী পত্রিকায় এক জন লেখক সঙ্গীতপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে, বিশেষ করিয়া গ্রামোফোন সঙ্গীতপরায়ণ ব্যক্তিকে, উদ্বাহবন্ধন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"beware of any such fancies which so inevitably lead to the altar and matrimony."

কেন না, উহার ফল দাঁড়াইবে এই,—

> One day you will arrive home and find that instead of the old and well-beloved mistress, your gramophone, there is another, a wife, waiting for you. No man can serve two **masters** and to serve two **mistresses** is even more incredible."

বিবাহিত কোন ব্যক্তি যদি কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই সাক্ষী দিবেন, এই ব্যাপারে "la belle dame" একান্তই "sans merci."

তবে ইহাও বলিতে হয়, এক হাতে তালি বাজে না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন লিখিয়া গিয়াছেন, "ভার্য্যানিপীড়ন করিয়া আমার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল।" পুরুষ

মাত্রেরই ধারণা ভার্য্যানিপীড়ন না করিয়া কোন মহৎ কর্ম্ম সাধিত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের উল্লেখ করিতে পারি, এমন কি নেপোলিয়নও ভার্য্যা নিপীড়ন না করিয়া স্বকীয় রাজনীতির অনুসরণ করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি বোধ হয় সক্রেটিস, যিনি ভার্য্যা নিপীড়ন করিতে পারেন নাই পরন্তু ভার্য্যার দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহাকে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল। আমি এই সকল মহৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকিব। কিন্তু অপর পক্ষ তাহা শুনিবে কেন? দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভে লোহেনগ্রীনের গান বা স্বেতানার কোয়ার্টেট 'আউস্ মাইনেম লেবেন' চাপাইতে যাওয়া অত্যাচার বই কি, তা হোক না কেন সেই গানের প্রথম চরণ Nun zei Bedank mein Lieberchen। আর স্বেতানার কোয়ার্টেট? উহার শেষের দিকে যেখানে স্বেতানার বধিরতার সূচনা আছে তাহাতে ইউরোপের বিদগ্ধসমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা শুনিয়া প্রথম প্রথম আমার নিজেরই মনে হইত বধির হইয়া যাই; সুতরাং অপর পক্ষ হইতে আপত্তি যে আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি।

আরও একটা গুরুতর কথা আছে। বিবাহিত জীবনে ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে গেলে (কিংবা যে কোন সখ করিতে গেলে) দ্রুত চরিত্রের অবনতি হইতে বাধ্য। জীবনে কখনও হিসাবনিকাশ দিতে ভয় পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এখন কিন্তু বাজার দেনা স্বীকার করিতে পারি না, চেক বই লুকাইয়া রাখি, যে মাসে রেকর্ডের বিল দিতে হইবে তাহার মাস দুই আগে হইতেই গার্হস্থ্য বজেটে ও ফাইনান্সে ঘোরতর গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি যাহাতে গোলে হরিবোলে বিশ-ত্রিশটা টাকা বাহির করিয়া লইতে পারি। গভীর রাত্রিতে কিংবা নিঝুম মধ্যাহ্নে রেকর্ড লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করি। এমন কি ইহাও মনে হয় স্ত্রী শয্যাগত কাতর হইয়া পড়িলে ভাল হয়, ঐ ফাঁকে এক গাদা নূতন রেকর্ড আনিয়া পুরাতন রেকর্ডের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিব, তিনি টেরও পাইবেন না! একবার এইরূপ করিতে গিয়া কি ভাবে ধরা পড়িয়াছিলাম বলি। দুই বৎসর পূর্ব্বে বুশ ট্রিঙ্ক কোয়ার্টেট ও রেজিনাল্ড কেল মিলিয়া ব্রাহ্মসের সুবিখ্যাত ক্ল্যারিনেট কুইন্টেটের একটি অপূর্ব্ব রেকর্ড করিয়াছেন। এই সংবাদ শোনা অবধি মনে শান্তি নাই, কি করিয়া কিনি। একটি দিন যায়, না ত একটি বৎসর যায়। তবু আটটি মাস কাটাইয়া দিলাম। আর থাকিতে পারি না, সোজা দোকানে গিয়া অর্ডার দিয়া আসিলাম। তখন জবাবদিহির প্রশ্ন নাই। মাস দুই পরে যখন রেকর্ড আসিল তখনও নিরাপদ, কারণ ঠিকানা অন্যত্র দিয়া রাখিয়াছি, খবর ঐখানেই যায়। কিন্তু

রেকর্ড বাড়ীতে আনি কি করিয়া ? দৈবক্রমে পত্নী একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে রেকর্ডগুলি বাড়ীতে আনিয়া পুরাতন রেকর্ডের সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে মিশাইয়া দিয়া অ্যালবামটি আলমারীতে বইএর পিছনে লুকাইয়া রাখিলাম। এক সপ্তাহ যায়, দুই সপ্তাহ যায়, বাড়ীতে পিস্তল রাখিয়া বিপ্লববাদীদের যে অবস্থা, মনের অবস্থা অনেকটা সেই প্রকার, কখন বাড়ী ঢুকিয়া দেখিব খানাতল্লাসী হইতেছে বা হইয়াছে। দুই মাস কাটিয়া গেল, মন অনেকটা স্থির হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় এক দিন বাড়ী ফিরিয়া দেখি বিছানার উপরে একখানি ব্রাউন রং-এর অ্যালবাম, সোনার জলে বড় বড় অক্ষরে লেখা—ব্রামস্ কুইন্টেট ইন বি মাইনর (ওপাস—১১৫)।

এক একবার মনে গ্লানি হয়, নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়—দূর হউক ইউরোপীয় সঙ্গীত, আমি মাথা উঁচু করিয়া লোকের চোখে চোখে চাহিয়া বাঁচি!

বন্ধুদের কথা আর বলিব না। সে আরও শোকাবহ ব্যাপার। যাঁহারা চিন্তা এবং কর্ম্মের সাথী ছিলেন, যাঁহাদের সঙ্গে এক সৌরজগতের গ্রহমালার মত সমান্তরাল কক্ষে বহু বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়াছি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের কল্যাণে তাঁহারা ধূমকেতুতে পরিণত হইয়াছেন। কেহ হ্যালির ধূমকেতুর মত ছিয়াত্তর বৎসর পর পর আসেন, অন্যেরা একবার নিকটে আসিয়া প্যারাবোলিক কক্ষ বাহিয়া চলিয়া যে যান আর ফিরেন না।

বেসুরা হইতে সুরে লইয়া যাও

নিজের কথা বলিতে মত্ত হইয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এইবার প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। আমার যে বন্ধুটি বলিয়াছিলেন, ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিবার সময়ে তাঁহার এক মাত্র বিচার্য্য বিষয় হয় কোনটা সব চেয়ে কম খারাপ লাগিয়াছে, তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। শৈশব হইতে ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিতে অভ্যস্ত নন এরূপ কোন বাঙালী, শুবার্ট, ব্রামস্ বা বেটোভেন প্রথম দিন শুনিয়াই যদি আহা মরি করিতে আরম্ভ করেন তবে বুঝিব তিনি লোক সোজা নন, তাঁহার চরিত্রে প্যাচ আছে। ইউরোপীয় সঙ্গীত ভাল লাগাইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রত্যেক অকপট বাঙালীকেই গোড়ার দিকে এই প্রার্থনাটি করিতে হইবে—বেসুরা হইতে সুরে লইয়া যাও। এই প্রার্থনা কতদূর পূরণ হইবে তাহা নির্ভর করিবে অধ্যবসায়ের উপর; এই ব্যাপারে এক মাত্র অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই ভগবান সহায়তা করিবেন।

বেসুরা হইতে সুরে যাইবার বহু সিঁড়ি। প্রথমত কাণে ভাল লাগা, দ্বিতীয়ত সুর চিনিতে পারা, তৃতীয়ত সঙ্গীতের কাঠামো ধরিতে পারা, চতুর্থত বিভিন্ন পার্ট-গুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে শুনিতে পারা, পঞ্চমত যন্ত্রের ধ্বনি চিনিতে পারা, ষষ্ঠত হার্ম্মনি ও কাউন্টার পয়েন্টের ধাক্কা সামলান, তার পর ঠাট বুঝিতে পারা, তার পর এই ভাবে সমগ্রতার অনুভূতি ও রসবোধ পর্য্যন্ত।

যাঁহাদের কাণ আছে তাঁহারা হয়ত সুর চিনিবার কথা শুনিয়া হাসিবেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্ত সোজা নয়। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি দশ বিশটা সমান আকৃতির ও সমান বয়সের বাঘ বা সিংহ দেখিয়া প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র ভাবে চিনিতে পারিবেন ? অথচ মার্টিন জনসন তাঁহার সিংহ সংক্রান্ত বই-এ বলিয়াছেন, মানুষের চেহারা যেমন ব্যক্তিগত সিংহের চেহারাও তেমনই ব্যক্তিগত। কিংবা সাহেবদের কথা ধরুন, সব সাহেবের চেহারাই প্রথম প্রথম আমাদের কাছে এক রকম ঠেকে। তেমনই সব ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুরও নূতন শ্রোতার কাছে এক বলিয়া জ্ঞান হয়।

নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। মাইষ্টারসিঙ্গারের ভূমিকার সুর ও ধরণ এত বিশিষ্ট যে কাহারও ভুল হইবার নয়। প্রথম আমি উহা শুনি কলিকাতা সিমফনী অর্কেষ্ট্রার একটি কনসার্টে। যাহাতে শুনিতে একটু সহায়তা হয় সেইজন্য ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ীতে গ্রামোফোনে উহা শুনিয়া গিয়াছিলাম। তবু কনসার্ট হলে গিয়া মনে হয় নাই, যে জিনিষটি শুনিতেছি উহা আর গ্রামোফোনে শোনা জিনিষ এক। আমার সুরবোধ স্থূল বলিতে পারেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই যে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বড় কোন নিদর্শন তিন চার বার না শুনিলে এখনও চিনিতে পারি না, প্রথম প্রথম পনর যোল বার না শুনিলে চিনিতাম না।

কোলের শিশু যেমন একবার দেখিয়া কাহাকেও চেনে না, দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়, এবং কবে কাহাকে চিনিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে পারে না, আমিও তেমনি প্রথম দিকে শোনা জিনিষ কবে পরিচিত হইয়া উঠিল এখন আর তাহা বলিতে পারিব না। একসঙ্গে হাইডন্ মোৎসার্ট ও বেটোভেনের অনেকগুলি কোয়ার্টেট ধরিয়াছিলাম। কোন্টা কি, কিছুমাত্র বোধ ছিল না, ধীরে ধীরে একটা জিনিষ মনের ভিতর দানা ধরিয়া উঠিল। সেটি মোৎসার্টের কোয়ার্টেট ইন বি ফ্ল্যাট মেজরের (কে ৪৫৮; যেটি হান্ট কোয়ার্টেট নামে পরিচিত) প্রথম মুভমেণ্ট। তার পর চিনিলাম উহারই 'মিনুয়েট' ও 'ট্রিয়ো,' তার পর উহার অন্য মুভমেণ্টগুলি। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে মোৎসার্টের কোয়ার্টেট ইন সি মেজর (কে ৪৬৫) বেটোভেনের কোয়ার্টেট ইন এফ মেজর (ওপাস ১৩৫), কোয়ার্টেট ইন এ মাইনর (ওপাস ১৩২), কোয়ার্টেট ইন ই মাইনর (ওপাস ৫৯, ২নং) রূপ ধরিতে লাগিল।

সিমফনী আরও ঘোরালো ব্যাপার। প্রথমে ওদিকে একেবারেই ঘেঁষি নাই। কিন্তু নিতান্ত দৈবক্রমে এমন একটি জিনিষ দিয়া এই বিষয়ে আমার হাতে খড়ি হইল যাহা আমি চিরদিন সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিব। সেটি বেটোভেনের দ্বিতীয় সিমফনীর দ্বিতীয় মুভমেণ্ট। বোধ করি উহার সুর ও অর্কেষ্ট্রেশনের অপরূপ মাধুর্য্যই আমাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন উহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। পরে টোভীর উক্তি পড়িয়াছি যে, "To many a musical child, or child in musical matters, this movement has brought about the first awakening to a sense of beauty in music." উহা আমার বেলাতে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। ইউরোপীয় সঙ্গীতের কোনও নিদর্শন এখনও আমার কাছে এর চেয়ে বেশী ভাল লাগে কি না বলিতে পারি না।

ইউরোপীয় সঙ্গীতে মুস্কিল আমাদের হয় কাঠামো লইয়া। আমাদের নিজেদের সঙ্গীত প্রথমত আয়তনে বড় নয়, তারপর সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত; এই প্রত্যেকটি ভাগও আবার ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিয়া বা বাজাইয়া শ্রোতার কাণে নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইউরোপীয় সঙ্গীতে এই পুনরাবৃত্তির আতিশয্য একেবারেই নাই। সোনাটা ফর্ম্মে পুনরাবৃত্তি এক রিক্যাপিটুলেশনে ভিন্ন হয় না, তাহাতেও নানারকমের পার্থক্য থাকে। এখানে 'ফুগে'র পুনরাবৃত্তির কথা বলিব না, কারণ 'ফুগে'র যে কি রকম পুনরাবৃত্তি তাহা বাপের দুই-এক খানা 'প্রেলুড ও ফুগ' চাখিবার চেষ্টা করিয়াই বুঝিয়াছি। ইহার উপর আবার আর একটা ঝঞ্ঝাট আছে। আমাদের সঙ্গীতের প্রত্যেকটি অংশকে আমরা যথাসম্ভব স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি; আমাদের কাছে মনে হয়, ইউরোপীয় সঙ্গীত-স্রষ্টারা চেষ্টা করেন যথাসম্ভব অস্পষ্ট করিবার। বেটোভেনের' এরোইকা'র (তৃতীয় সিম্‌ফনীর) প্ল্যান বুঝিবার চেষ্টা এখনও আমি পারতপক্ষে করি না। 'সোনাটা-ফর্ম্ম'কে আক্রমণ করিয়া যেটুকু আংশিক ফল পাইয়াছি সে একমাত্র মোৎসার্টের দয়ায়।

তবে এ কথা বলিতে পারি, কাঠামোই হউক, আর সুরই হউক, আর অর্কেষ্ট্রেশনই হউক—সবই ভাল লাগাইবার একমাত্র উপায় বারবার, অসংখ্য বার, শোনা। শুনিতে শুনিতে কোনটা না কোনটা ভাল লাগিয়া যাইবে, কোনটা না কোনটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবেই। কিন্তু এখানেও সমস্যা—কতগুলি শোনা, কি লইয়া আরম্ভ করা? বিচিত্র যন্ত্রবাহুল্য, পিয়ানো বেহালা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণবয়ব অর্কেষ্ট্রা পর্য্যন্ত; বিচিত্র রূপবাহুল্য, সোনাটা হইতে আরম্ভ করিয়া সিমফনী পর্য্যন্ত; বিচিত্র গঠন-বাহুল্য, মিনুয়েট বা ট্রিয়ো হইতে আরম্ভ করিয়া 'সোনাটা ফর্ম্ম' ও 'ফুগ' পর্য্যন্ত; বিচিত্র সৃষ্টিবাহুল্য, পালেষ্ট্রিনা হইতে আরম্ভ করিয়া শোয়েনবার্গ পর্য্যন্ত। কোথায়

তাহার আরম্ভ কোথায় তাহার শেষ বলা দুরূহ। আমার বেলাতে এই বিশালতার মধ্যে পথ হইয়া গিয়াছিল নিতান্তই দৈবক্রমে, নিজের অভিরুচিতে নয়, জ্ঞানে নয়, ইচ্ছায় নয়। তবে পথ না চিনিয়া ঘোরা হইতে এইটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, ইউরোপীয় সমালোচকেরা প্রায় সকল বিষয়েই সহায়ক হইলেও আমাদের দেশের প্রথম শিক্ষার্থীর ভাল লাগা মন্দ লাগা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য নন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি, চেম্বার মিউজিক সম্বন্ধে প্রায়শই উপদেশ পাইবেন, চাইকভস্কীর কোয়ার্টেট ইন ডি মেজরের (ওপাস ১১) 'আন্দান্তে কান্তাবিলে' দিয়া আরম্ভ করা উচিত। টলষ্টয় নাকি এইটি শুনিয়া করুণ রসে আপ্লুত হইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, আমি কিন্তু উহা শুনিয়া অন্য কারণে কাঁদিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। পক্ষান্তরে প্রথম শিক্ষার্থীকে যদি কোন বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে সে বেটোভেনের শেষ চারিটি কোয়ার্টেট সম্বন্ধে; কিন্তু ঠিক বেটোভেনের সর্ব্বশেষ কোয়ার্টেটই (ইন এফ মেজর, ওপাস ১৩৫) আমার সকলের আগে ভাল লাগিয়াছিল। তেমনই, হাইডনের বেলাতেও ই ফ্ল্যাট মেজর কোয়ার্টেট (ওপাস ২০, ১নং) সম্বন্ধে টোভী লিখিয়াছেন, "perhaps there are not more people who can appreciate this work than there are connisseurs of Tang china." আমার মত আনাড়ীরও প্রথম শুনিয়াই উহা ভাল লাগিয়াছিল, অথচ হাইডনের যে কোয়ার্টেট সর্ব্বজনপ্রিয় বলিয়া ঘোষিত (ওপাস ৫৫, ৩নং) উহা আমার কাণে প্রথমে তেমন শ্রুতিসুখকর বলিয়া মনে হয় নাই। এই ব্যাপারের কোন সূত্র নাই, নিয়ম নাই। কুপর‍্যা, বাখ, হ্যাণ্ডেল, করেল্লি, স্কারলাত্তি এক দিক হইতে ভাল লাগে, আবার ভাগনারও ভাল লাগে কিন্তু রোমান্টিক বলিয়া যতদিনই লিস্‌ট শুনিতে গিয়াছি ততদিনই নিরাশ হইয়াছি। বলিতে ভয় এবং সঙ্কোচ হয় এখনও শপ্যা ভাল করিয়া বরদাস্ত হয় নাই আর চাইকভস্কী আমার কাছে একেবারেই দুঃসহ ঠেকে। যন্ত্রের আওয়াজের মধ্যে মোটের উপর পিয়ানোর আওয়াজ আমার কাছে ষ্ট্রিঙ্গ কোয়ার্টেটের সম্মিলিত আওয়াজ অপেক্ষা অনেক কম মিষ্ট বলিয়া মনে হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু দিতে পারি।

পরের প্রতি উপদেশ ও আত্মপরীক্ষা

উপসংহারে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রথম বিষয়, যাঁহারা ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এত হাঙ্গামা করিতে প্রস্তুত ন'ন তাঁহারা কি করিয়া বিদগ্ধসমাজে আত্মসম্মান রাখিয়া চলিতে পারিবেন; দ্বিতীয় বিষয়, ইউরোপীয় সঙ্গীতের পল্লবগ্রাহিতা করিয়া আমি নিজে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

কোন ভদ্রলোক ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধার ধারেন না অথচ কালচার্ড সমাজে প্রতিপত্তিও হারাইতে চান না, তিনি কি করিবেন? পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি তিনি পিয়ানোকে পিয়ানোফর্টে বলিবেন। ইহা ছাড়া অন্য কতকগুলি ঘাঁতঘোতও বলিয়া দিতেছি। পিয়ানো বাজনার আলোচনা উঠিলে পাডেরেভস্কির নাম যথাসম্ভব কম করিবেন, কিন্তু রুবিনষ্টাইন, বুসোনি ইত্যাদি যথেষ্ট বলিবেন, অর্দ্ধস্বগতভাবে 'পিয়ানিজ্‌ম্' এই কথাটি ব্যবহার করিবেন। কেহ যদি 'মুন লাইট সোনাটা'র উল্লেখ করেন তাহা হইলে প্রথমে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিবেন, পরে বলিয়া উঠিবেন, "ওঃ, সোনাটা ইন সি শার্প মাইনর" কিম্বা "সোনাটা কোয়াসি ফ্যান্টাসিয়া।" কিন্তু 'হামারক্লাভিয়ার সোনাটা', 'পাউকেনশ্লাগ সিম্ফনী', 'ফোরেলেন কুইণ্টেট' ইত্যাদি বলিতে সঙ্কোচ করিবেন না। বেহালা বাদন সম্বন্ধে ক্রাইসলারের নাম কিছুতেই করিবেন না, বলিবেন যোয়াখিমের কথা। কণ্ডাক্টর হিসাবে তস্কানিনির নাম না করিয়া পারিবেন না কিন্তু সুকৌশলে নিকিশকে টানিয়া আনিবেন। যদি বড়লোকের দ্বারা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণের আলোচনা উঠে তাহা হইলে বড়লোকের সমর্থন করিবার ইচ্ছা থাকিলে এস্তেয়ারহাংস ও এস্তেয়ারহাংসি, মিঃ ক্রিষ্টি, গ্লিণ্ডবোর্ণ এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিবেন; আর যদি বড়লোকের নিন্দাই আপনার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আর্চ্চবিপশ হিয়েরোনিমাসের নাম করিবেন। এইভাবে চলিলে ইউরোপীয়সঙ্গীতজ্ঞ মহলেও আপনাকে হতমান হইতে হইবে না।

কিন্তু এই পথে চলিবার অসুবিধাও আছে একটু। একটি বন্ধুর দৃষ্টান্ত দিব। বন্ধু কিছুদিন আমার সঙ্গে বসিয়া ইউরোপীয় সঙ্গীতের আলোচনা করিয়াছিলেন। কারণ—আংশিকভাবে বন্ধুপ্রীতি (প্যালিঅণ্টলজী অধ্যয়নের বেলাতে আমি সহযোগিতা করিয়াছিলাম উহার প্রতিদান দিবার ইচ্ছা) কিছু কালচার্ড হইবার লোভ (বন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিদগ্ধসমাজে চলাফেরা করেন), কিছু সঙ্গীতপ্রীতি (বন্ধু সঙ্গীত ভালবাসেন এইরূপ একটা ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন, আসলে ভালও যে না বাসেন তাহা নয়)। সুতরাং আমার কাছে বসিয়া এক্সপজিশুন, ডেভেলাপমেণ্ট, রিক্যাপিটুলেশুন, কোডা; সোনাটা, ট্রিও, কোয়ার্টেট, কুইণ্টেট, সেক্সটেট, সেপ্টেট, অক্টেট, ননেট, সিমফনী; লার্গো, লার্গেতো, আদাজিও, আন্দান্তে, আলেগ্রো, আলেগ্রেতো, ভিভাচে, প্রেস্তো, প্রেস্তিসিমো ইত্যাদি মুখস্থ করেন, আর যখনই কোন সঙ্গীত একটু কম বেসুরা মনে হয় তখনই চীৎকার করিয়া উঠেন, "ঐ, 'টনিকে' ফিরিয়া যাইতেছে।" একটা বিষয় এইরূপে একটু গড়গড় হইয়া গেলেই তিনি কিছুদিনের মত আর আসিতেন না, বোধ করি কালচার্ড সমাজে সেই

কালটুকু ক্ষেপণ করিতেন। আমার কিন্তু বন্ধুর জন্য সর্ব্বদাই একটা ভাবনা ছিল—যেমন ভাবনা অভিভাবকের থাকে বালকের হাতে তুবড়ী দিয়া, কারণ বন্ধু সরল-অন্তঃকরণ। একদিন তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহভরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম তুবড়ীতে মুখ পুড়িয়া আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে। তিনি উত্তর দিলেন—"সেদিন তোমার এখান হইতে অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে ছিলেন। আমি বলিলাম এই বেটোভেন শুনিয়া আসিতেছি, খুব ভাল লাগিল। একটি ভদ্রলোক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া একটা মন্তব্য করিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বলিলেন তিনি?" বন্ধু জবাব দিলেন, "একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন তিনি বলিলেন, তা আর আশ্চর্য্য কি ইণ্ডিয়ান মিউজিক মাইনর স্কেলে বেটোভেনও মাইনর স্কেলে লিখিয়াছেন, তাই ভাল লাগিয়াছে।" এই কালচার্যাল্ দমবাজীর কাছে পরাস্ত হইয়া ভাগিয়া আসার জন্য বন্ধুকে আমি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ভৎর্সনা করিতে লাগিলাম, এমন কি ক্রোধান্ধ হইয়া রসবোধ পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিলাম। বলিতে লাগিলাম, "কেন ওর মন্তব্য মানিয়া লইলেন? বলিতে পারিলেন না ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় মাইনর মোডের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক মেজর মোডের সঙ্গেও ততটুকু সম্পর্ক, বলিতে পারিলেন না বেটোভেনের নয়টা সিমফনীর মধ্যে সাতটাই 'মেজর মোডে'; ষোলটা কোয়ার্টেটের মধ্যে, এগারটা 'মেজর মোডে'; বত্রিশটা পিয়ানো সোনাটার মধ্যে বাইশটাই 'মেজর মোডে'; ইত্যাদি। কিন্তু ইহাতে লাভ হইল এই, বন্ধু মনের দুঃখে চলিয়া গেলেন আর আজ পর্য্যন্তও ইউরোপীয় সঙ্গীতে ফিরিয়া আসিলেন না।

নিজের সম্বন্ধে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতে পারি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের পিছনে ছোটা একটা বড় 'এডভেঞ্চার'। ইহাতে নৈতিক অবনতি কিছু হইয়া থাকিলেও (প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ দ্রষ্টব্য) মোটের উপর লাভও কম হয় নাই। প্রথম বার চ্যাপম্যানের হোমার পড়িয়া মনের অবস্থা কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কীটস্ একটি বিখ্যাত সনেট লিখিয়াছেন। সেই অনুভূতির প্রসারতা, গভীর শান্তি, অতল রহস্য ও উচ্ছল আনন্দ তাঁহাকে যে ভাষা দিয়াছিল সে ভাষা সাধারণ মানুষের জুটিবার নয়। তবে এইটুকু আভাষ দিতে পারি, ইউরোপীয় সঙ্গীত একটা স্বতন্ত্র জগৎ, স্বতন্ত্র বিশ্ব বলিলে বোধ করি আরও ভাল হয়। আমাদের প্রতিদিনের ভাল লাগা মন্দ লাগার কষ্টিপাথরে উহাকে যাচাই করিতে পারি না। হয়ত ইহা আমার অজ্ঞান এবং সংকীর্ণতার ফল, তবে আমার

কাছে অনেক সময়েই মনে হইয়াছে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত ধ্বনির নক্সা (প্যাটার্ণ) মাত্র, ইউরোপীয় সঙ্গীত একটা ভাষা। হৃদয়ের সঙ্গে, অন্তরতম অন্তরের সঙ্গে সাধারণ অনুভূতি ও আবেগকে অতিক্রম করিয়া শব্দহীনকে কথা কহিবার ক্ষমতা উহার আছে, উহার বোধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও উহা শুধু শ্রুতি ও হৃদয়াবেগ হইতেই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না।

সে যাহাই হউক, তত্ত্ব লইয়া তর্ক করিবার মত সাহস আমার নাই; ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিবার সময়ে মনের যে অবস্থা হয়, শুধু তাহাই স্বীকার করিলাম। ইহাকেই যদি আপনারা অতিরঞ্জন জ্ঞান করেন তাহা হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত না শুনিবার সময়ে আমার মনে যাহা হয় তাহা শুনিলে কি বলিবেন অনুমান করিতেও ভয় পাইতেছি। যখন অবকাশ বা উপায় থাকে না তখন বসিয়া বসিয়া ভবিষ্যতের প্ল্যান করি, ক্যাটালগ পত্রিকা পুস্তক ঘাঁটিয়া ইহার পর কোন জিনিষটি শুনিব, কোন রেকর্ড কিনিব তাহার তালিকা করিতে ব্যস্ত থাকি। তালিকা ক্রমেই বড় হইয়া উঠে। ছাঁটাই করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু কোনদিকে ছাঁটিব। কিছুদিন কি খালি কণ্ঠসঙ্গীত শুনিব? অপেরা শুনিব? না ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক শুনিব, না একেবারে 'পলিফনিক স্কুলে' চলিয়া যাইব—পালেষ্ট্রিনা, ভিত্তোরিয়া, অর্লাণ্ডো ডি লাসো? কোনটাই ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, শুনিয়াছি ব্রামসের 'ফির এনষ্টে গেসেঙ্গে' নাকি ভারি চমৎকার, কাজাল্‌স্ চেলোতে বাখের যে সুইট গুলি বাজাইয়াছেন সেগুলি নাকি অপূর্ব্ব, দনিৎসেত্তির লুসিয়া ডি লামারমুরের যে রেকর্ড হইয়াছে তাহা নাকি অসম্ভব রকম ভাল, ভ্যাটিক্যান হইতে নাকি ভিত্তোরিয়ার কতকগুলি রেস্পন্সরী প্রকাশিত হইয়াছে, কুপর‍্যা-র তেনেব্রি নাকি শুনিবার মত একটা জিনিষ। কলিকাতার কোন দোকানে এইগুলি শুনিবার উপায় নাই, তাই কোনটা কি রকম আন্দাজ করিবার জন্য বই-এর শরণাপন্ন হইতে হয়। এটা এই ধরণের, ওটা ঐ ধরণের। পড়িতে পড়িতে মাথা যখন ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় এই সবগুলি অশ্রুত অজানা সুর কানে শুনিতেছি, প্রত্যেকটার সুর স্বতন্ত্র ভাবে কানে বাজিতেছে।

হাসিতেছেন এবং বলিতেছেন বোধ হয় যে ব্যক্তি না শুনিয়াও নিজেকে এই ভাবে সম্মোহিত করিতে পারে তার শোনাও আত্মসম্মোহন মাত্র, তার ভাল লাগা মন্দ লাগার আত্মনিরপেক্ষ কোন মূল্য নাই—

Hold this sea shell to your ear,
And you shall hear,
Not the andante of the sea,

Not the wild wind's symphony,
But your own heart's minstrelsy.

খুবই সত্য, কিন্তু ইহার উত্তরে আমিও বলিব, বাসনার নিন্দা করিবেন না, বাসনা ছোট জিনিষ হয়, জীবনের রস শেষ ফোঁটা পর্য্যন্ত নিঃশেষিত করিয়া লইবার উহাই একমাত্র উপায়—

"For in truth the mind
is indissociable from what it contemplates,
as thirst and generous wine are to a man that drinketh
nor kenneth whether his pleasure is more in his desire
or in the savor of the rich grape that allays it."

আর রসস্রষ্টার প্রতিও কি আমাদের কর্ত্তব্য নাই?

"You do poets and their song
A grievous wrong
if your own heart does not bring
To their deep imagining
As much beauty as they sing."

পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে

(চার্লস্ এণ্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ)

গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙীন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বল্‌চেন,
"তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
তোমাদের কাছে একি কিছুই নয় ?
তাকাও দেখি, বলো দেখি,
কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য ?"

পুণ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হোলো।
মনে জাগ্‌ল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাস বাণী :—
"এস, আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
এস, যারা ভারাক্রান্ত,
আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আন্‌ল আমাদের মনে,
ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
শুনলুম, "উর্দ্ধে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেচি তোমারি দিকে।"

চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন ক'রে চলেচে
ক্লান্ত, আক্রান্ত গুরুভারে,

তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে উর্দ্ধে উদ্বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত, তৃষাত, তারা ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।

এদিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন :—
"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে-নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২।৪।৪০
মংপু
দার্জিলিং

কেন বৃথা স্বপ্ন-সাধ ?

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

যে অন্তর শুধু খোঁজে অন্তরের গহনবাসীরে
যার পরিতৃপ্তি শুধু তৃপ্তিহীন তৃষার প্রদাহে
তাহার কুহক ভুলি, লহ তুলি অবনম্র-শিরে
শত লক্ষ জীবনের রিক্ততার ভার ; শ্রদ্ধার উৎসাহে
নবপ্রাতে উজ্জীবিত হোক তব অন্তর-অঙ্কুর ;
নিষ্পলক নেত্রে চাহ ভবিষ্যের ধ্রুব-লোক পানে ;
অবহেলা লাঞ্ছনায় শীর্ণ হোক মুহূর্ত্ত ভঙ্গুর ;
কেন বৃথা স্বপ্ন-সাধ ? সত্য তোল জাগাইয়া গানে।

"আমার মরণে হবে—"

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আমার হাসির বিষে মরে যায় শ্যাম তৃণ-রাজি ;
আমার চোখের জল আকাশেরে করেছে মলিন ;
ধমনীপ্রবাহে মোর স্বার্থের সংঘাত উঠে বাজি ;
মোর দান গ্রহীতারে করে তোলে আরও দীনহীন।

আমি যবে গান গাই, শিহরিয়া স্তব্ধ হয় পাখী ;
মোর উপাসনা করে ভগবানে আতঙ্ক-চঞ্চল ;
আমার কর্ম্মের তাপে পৃথ্বী কাঁপি উঠে থাকি থাকি ;
গগনের ত্রস্ত তারা চেয়ে রয় পাণ্ডুর-বিহ্বল !

আমি বলি, 'পাপ নাই';—লজ্জাহীন এই অস্বীকার
আমারে ঘেরিয়া রচে গাঢ়তর পাপের আঁধার।

তবু মোরে সহ্য করে ধরিত্রীর উৎপীড়িত প্রাণ
ভবিষ্যের পানে চেয়ে। মুহূর্ত্তের তুচ্ছ জীব আমি ;
দিবসের বিষবাষ্প মুহূর্ত্তে লভিবে অবসান
মৃত্যুর শিশির-শান্তি সন্ধ্যায় আসিবে ত্বরা নামি।

তারপর মোরে লয়ে বিশ্বের এ রসায়নাগারে
চলিবে অপূর্ব্ব খেলা। দেহমন ভাঙি তিলে তিলে,
প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় পাবকে শোধন করি তারে,
সৌন্দর্য্য-কণিকারূপে ছড়াইবে সমগ্র নিখিলে।

আমার মরণে হবে আরও নীল আকাশের নীল,
বর্ণে গন্ধে রূপে গানে সুসমৃদ্ধ হইবে নিখিল।

বৈশাখী পূর্ণিমা

কানাই সামন্ত

আন্দোলিত স্বপ্নের অঞ্চল, হের, বৈশাখী পূর্ণিমা
বিরাজিছে সুপ্ত দিগ্বিদিকে ! যেথা প্রান্তরের সীমা
তালতরুশ্রেণীস্তব্ধ ; অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর ;
জনশূন্য সৌধছাদ ; খোয়াইএর বালুকা কঙ্কর
প্রবাহিনী নির্ঝরিণীস্রোতে চঞ্চল সফরী স্থির ;
নবপ্রাণসঞ্জীবিত পথতৃণে শোভিছে শিশির—
আনন্দাশ্রুজল।
বিকশিত কামিনী কূটজ ফুলে
মদির সৌরভ জড়ায় পল্লবজাল : ঢুলে ঢুলে
পড়িছে পবন ত্রিযামা যামিনীশেষে। বহুদূর
বৃক্ষশাখে বিহঙ্গের কাতর মিনতিপূর্ণ সুর
বলে বউ কথা কও : পক্ষপুটে—অসিতধূসর
কণ্ঠদেশে চন্দ্রের চন্দ্রিকা।
অস্তঅচলশিখর
উত্তরিয়া স্বপ্নের দেবতা ফিরে চায়। জাগে ধীরে
ঊষা। জাগে মৃদুমন্দ গুঞ্জরণ লোকালয়তীরে।

বোলপুর,
১ জ্যৈষ্ঠ, '৪৭

পুস্তক সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়'

বাংলাভাষা পরিচয় ঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা।৵০+১৮০। মূল্য ৮০ বারো আনা। ১৯৩৮।

সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ যে বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ নহে এই সত্য বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব ধ্বনি, ধ্বনিসমন্বয়, ধ্বনিবিপর্য্যয়, শব্দ গঠন প্রণালী বাগ্‌ধারা প্রভৃতি রহিয়াছে। 'সাধনা' 'ভারতী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত বিষয়ে ১২৯৯ সাল হইতে আলোচনা আরম্ভ করেন। পরে এই প্রবন্ধ-মালা তাঁহার "শব্দতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই বই-খানিকে ঠিক বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ বলিতে পারা যায় না; বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষার যে আলোচনা রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত প্রবন্ধে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারই পরিণতি দেখিতেছি তাঁহার বর্ত্তমান "বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থে।

যখন রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় আলোচনা আরম্ভ করেন, সে সময় এ সম্পর্কে বাঙ্গালাভাষায় তেমন কোন আন্দোলন ছিল না। বাঙ্গালাভাষারও যে তত্ত্ববিচার চলিতে পারে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালীর শিক্ষিতসমাজ তখনও উল্লেখযোগ্যভাবে সচেতন হইয়া উঠে নাই। এজন্য বাঙ্গালা শব্দতত্ত্বসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবেও কবির খ্যাতি হইয়াছিল।

ক্রমশঃ একদিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাঙ্গালীর এই দুইটি শিক্ষাপ্রচারকেন্দ্রে এ বিষয়ে চেতনাসঞ্চার হইল। প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্ণধার স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিভাগ খোলা হইল। এইস্থান হইতেই বাঙ্গালাদেশে দেশীয়ভাষার চর্চ্চা সুসম্বদ্ধভাবে আরম্ভ হয়। নবলব্ধ ইউরোপীয় তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাতত্ত্বালোচনার আন্দোলন এখান হইতেই সচেতনভাবে করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করেন তখন তাঁহার সম্মুখে কোনও সুষ্ঠু আদর্শ ছিল না; তখনও এ বিষয়ে আলোচনার যুক্তিমূলক রীতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। "বাংলাভাষা পরিচয়ে" কবি এই নবলব্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন; কিন্তু মূলত তাঁহার বক্তব্য শব্দতত্ত্বের বক্তব্য হইতে অধিক অগ্রসর হয় নাই।

এই গ্রন্থে বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে কিছু বেশি আলোচনা আছে, কারক ও ক্রিয়া সম্পর্কেও দুইচারিটি নোতুন তথ্যের খোঁজ ইহাতে পাওয়া যাইবে; রবীন্দ্রনাথের অনন্যকরণীয় ভাষায় নীরস (?) ভাষাতত্ত্বের আলোচনাও অতিশয় সরস হইয়াছে। রচনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা কবির আছে তাহাই 'বাংলাভাষা পরিচয়ের' পাঠককে মুগ্ধ করিবে। ভাষাতত্ত্বের পুস্তক হিসাবে না হউক, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরূপে এই গ্রন্থ অনেকের নিকট আদরণীয় হইবে। কবি বাঙ্গালাভাষার পরিচয় দেওয়ার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অতিশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণীয়। ব্যাকরণ লিখিবার জন্য যে তথ্যানুসন্ধিৎসা ও ভাষার রহস্যের সহিত নিবিড় পরিচয় দরকার রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত অনেকস্থলেই পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই তথ্যসমাবেশের মধ্যে যে নিগূঢ় যোগসূত্র রহিয়াছে তাহার নির্ণয়ের জন্য যে উচ্ছ্বাসবিহীন খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রয়োজন তাহার অভাবও এই গ্রন্থের বহুস্থলেই লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। স্থানে স্থানে অতিশয় সরস Analogy বা উপমায় রচনা সমৃদ্ধ হইলেও বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষেত্রেই তথ্যবিশ্লেষণে অনবধানতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বইখানি ছাত্রদের জন্য; "বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদ কর্ত্তৃক মনোনীত।" সুতরাং ইহাতে অসাবধানতা থাকিলে ছাত্রের জ্ঞান ও লোকের শিক্ষায় বাধা জন্মাইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি অসাবধানতার কিঞ্চিৎ আলোচনা নীচে করা গেল। তৎপূর্ব্বে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই গ্রন্থের প্রারম্ভে এবং উপসংহারেও ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

(১)

"প্রাচীন ভারতবর্ষের অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল—শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্য ছিল প্রাচ্য হিন্দীর আদিতে। আর ছিল ওড্রী, উড়িয়া, গৌড়ী বাংলা। আসামীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গদ্য ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাইনে" [৵০]

"প্রাচীন ভারতের অস্পষ্ট ইতিবৃত্তের" প্রাকৃত লোকেরা শৌরসেনী ও মাগধীতে কথা কহিত না, কথা কহিত অস্ট্রীক বা কোলগোষ্ঠীয় ভাষায়। ঐতিহাসিকগণের মতে তৎপর দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়গোষ্ঠীয় ভাষার প্রচলন হয়; ইহার পর আসিলেন আর্য্যগণ আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্য ভাষা লইয়া। এই ভাষার সাহিত্যিকরূপ বৈদিক সংহিতার ভাষায় সংরক্ষিত আছে। এই সময়ে কথ্যভাষারূপে প্রাকৃতও প্রচলিত ছিল; এই সমস্ত প্রাকৃতের কিঞ্চিৎ নমুনা বেদের ভাষাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। "শৌরসেনী" বা "মাগধী" এবং অন্যান্য প্রাকৃত পরবর্ত্তী যুগের কথ্যভাষা হিসাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের প্রাকৃত ভাষা যে মাত্র শৌরসেনী ও মাগধী এই দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল এই মত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হর্ণলে সাহেব প্রচারিত করেন। [Grammar of the Gaudian Languages: Introduction: p. XXX] এখন এ মত ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্ত্তৃক একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। [Woolner: Introduction to Prakrit. p. 65.]

প্রাচ্যহিন্দীর (Eastern Hindi-র) আদিতে মাগধী ছিল না, ছিল অর্দ্ধমাগধী। ওড্রী বা গৌড়ীর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, এইগুলি অপভ্রংশ ভাষা—আরও পরবর্ত্তী যুগের। এই সময় "বাংলা" ভাষার কোনও প্রকার অস্তিত্ব ভাষাতাত্ত্বিকগণ কল্পনা করিতেও সাহসী হন নাই। "উড়িয়া" সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে; আসামী সম্পর্কেও তাই। "বাংলা", "আসামী" ও "উড়িয়া" আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাসমূহের অন্যতম।

(২)

"মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্ণলে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্ব্বের দিকে এসেছে। হর্ণলের মতে আর্য্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে।" [৺০]

হর্ণলে সাহেবের এই মতে পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এমন কি সার জর্জ্জ এ. গ্রীয়ার্সন পর্য্যন্ত সায় দিয়াছিলেন; ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মত চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করার পর এ মতের আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। [S. K. Chatterji: Origin and Development of the Bengali Language: pp. 150-178]

(৩)

"বাগ্‌যন্ত্রের একটা কিছু সূক্ষ্মভেদ আছে তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে" [পৃঃ ১০]

এ থিওরি বর্ত্তমানে একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছে। উচ্চারণের গড়ন বদলের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন ভেদই দায়ী নয়। দায়ী একটা বদ্ধমূল সংস্কার। এক জন এস্কিমো শিশুকে জন্ম মাত্র বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে রাখিলে সে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি এক জন জাত বাঙ্গালীর মতই উচ্চারণ করিতে শিখিবে। পরিণত বয়সেও অনেকে বৈদেশিক ভাষার ধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণ শিখিতে পারেন; এজন্য বাগ্‌যন্ত্রের কোনই ভেদের প্রয়োজন হয় না। [তুলনীয় Otto Jespersen: Language—Its Nature Development and Origin: Chapter XIV. pp. 255-56].

(৪)

"সুনীতিকুমার বলেন খৃষ্টীয় দশম শতকের কোনো এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই জন্ম কথাটা খাটে না। যে জিনিষ অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভ সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন।" [পৃঃ ৫৩]

সুনীতিবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই। যে সময়ে অপভ্রংশ ভাষার খোলস ছাড়িয়া বাঙ্গালা আত্মপ্রকাশ করিল সেই সময়ের কথাই সুনীতিবাবু বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখিলে কোন কিছু সম্পর্কেই জন্ম কথাটা খাটে না। সুনীতিবাবু অত্যন্ত সাবধানতার সহিত বাঙ্গালার জন্ম সময় নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। [তুলনীয়: ODBL. p. 17. "Definite dates cannot be laid down in language history."]

(৫)

"বাংলাভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ" [পৃঃ ৫৪]

একথা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভৃতির ভাষায় প্রমাণ মিলিবে [শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ—সুকুমার সেন] এই প্রসঙ্গে "রূপগোস্বামীর লেখা কারিকা থেকে" যে নমুনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার যৌক্তিকতা অতিশয় অল্প। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই সবজাতীয় লেখা রচিত হয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহজিয়াপন্থী বৈষ্ণবসাধকদিগের দ্বারা। রচনার মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য রূপগোস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনগণের নাম এই রচনার

সহিত ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত গদ্য স্বত্ররীতি অবলম্বনে রচিত—স্নুতরাং ইহাতে ক্রিয়াপদের আপেক্ষিক স্বল্পতা তো থাকিবেই। বাঙ্গালা ভাষাও কেবল গদ্য ভাষা নয়; রবীন্দ্রনাথ যে 'প্রাকৃত বাংলার' কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন রূপগোস্বামীর লেখাও সে পর্য্যায়ে পড়ে না। সর্ব্বপ্রাচীন বাঙ্গালার নিদর্শন চর্য্যাপদগুলির, তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এবং বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ভাষাতেও ক্রিয়াপদের সংকোচ মোটেই দেখা যায় না। ক্রিয়ার নানা প্রকার রূপভেদ, প্রচুর পরিমাণে যৌগিক ক্রিয়া, বিভিন্ন প্রকৃতির ভাবক্রিয়া, নানা ধরণের সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে।

(৬)

"এবং আশা করব সাধুভাষা তাকেই (চলিত ভাষাকে) আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম লাভ করবে।"

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাধুভাষা ও চলিতভাষার পৃথক অস্তিত্ব না থাকিয়াই পারে না। চলিত ভাষার রূপ যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল সাধুভাষার রূপও তেমনি পরিবর্ত্তনশীল।

(৭)

"বাংলা দেশের সবচেয়ে পুরানো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে—যেমন,

খনা ডেকে বলে যান,
রোদে ধান ছায়ায় পান,
দিনে রোদ রাতে জল
তাতে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক'রে হ'তে হ'তে ছন্দের মধ্যে পড়ে তিনের মাত্রা, যেমন

আনহিবসত আনহিচায,
বলে ডাক তার বিনাশ।" [পৃঃ ৭৫]

বাঙ্গালা ছন্দ সম্বন্ধে এই মতামত অতীব ভ্রান্ত। বাঙ্গালা দেশে সবচেয়ে পুরানো ছন্দ পাই চর্য্যাপদগুলিতে। ঐ ছন্দ বাঙ্গালার নিজস্ব ছন্দ নয়; পশ্চিমা অপভ্রংশের 'পাদাকুলক' অথবা 'চৌপাঈ'। এই পাদাকুলক ও চৌপাঈ হইতেই পরবর্ত্তীযুগে বাঙ্গালার স্বরঘাতপদ্ধতির ভিত্তিতে খাঁটি বাঙ্গালা ছন্দ পয়ারের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত উদাহরণ দিয়াছেন তাহা 'বাংলাভাষার' সবচেয়ে পুরানো ছন্দের নিদর্শন নয়। প্রবচনগুলির ভাষা মোটেই প্রাচীন নয়। ইহাদের মর্ম্মার্থ

অবশ্য পুরানো। কিন্তু দীনেশবাবুর মত ধরিয়া প্রবচনগুলিকে দূরযুগে টানিয়া লইয়া গেলে ভাষার ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। এই সমস্ত ভাষা অতি আধুনিক যুগের রচনা কোনও অজ্ঞাতনামা আধুনিক ছড়াকারের এই ছন্দও খাঁটি পয়ার নয়। সর্ব্বশেষে যে ছড়াটির উল্লেখ করা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ সেটির অর্থ বুঝাইবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা কবির বিনয়। কারণ অর্থ অতি সহজ—"আষাঢ় মাসে মেঘগর্জ্জন বৃষ্টির সূচনা করে, শ্রাবণে মেঘগর্জ্জন ধানের সূচনা করে। (মেঘগর্জ্জন > বৃষ্টিপাত) ভাদ্রমাসে মেঘগর্জ্জন ধানের শিষ উঠা সূচনা করে, আশ্বিনে মেঘগর্জ্জন কিছুরই সূচনা করেনা।"

(৮)

"পারসিক" [পৃঃ ৬৭] নহে "পারসীক"। এই শব্দটির প্রয়োগেও সুষ্ঠু হয় নাই। "ফারসী" হওয়া উচিত ছিল। পারসীক বলিলে ইন্দইরাণীয় ভাষা বুঝায় যাহার সর্ব্ব পুরাতন নিদর্শন পাওয়া যায় রাজা ধারয়বহুর (Darius) শিলালিখনে।

(৯)

করিতেছি চলিত ভাষায় "করছি" [পৃঃ ৭৮] হয় নাই।

* "করিছি" চলিত ভাষায় 'করছি' হইয়াছে। 'করিতেছি' হইয়াছে 'করত্যাছি' [দ্রষ্টব্য : ভাষার ইতিবৃত্ত—পৃঃ ১২৮ সুকুমার সেন]

(১০)

"বাংলা ক্রিয়াপদের সদ্যবর্ত্তমান ইল প্রত্যয়ে বিকল্পে এ এবং ও লাগে; যেমন "ক'রলো, ক'রলে" [পৃঃ ৮৫] —ইল প্রত্যয় বর্ত্তমানের প্রত্যয় নহে—অতীতের প্রত্যয়। সমাপিকা এবং অসমাপিকা ভেদেই —ইল, এবং —ইলে হয়—নিছক বিকল্পে হয় না।

"করলেম"—লেম প্রত্যয় কখনও দক্ষিণ বাঙ্গলার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয় না। অভিনয়ের কৃত্রিম ও অর্ব্বাচীন উচ্চারণে ইহার জন্ম।

(১১)

৮৬-৯১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং পরেও ১০০, ১০৬, এবং অন্যত্রও শব্দের অভ্যন্তরস্থিত স্বরধ্বনির নানারূপ পরিবর্ত্তনের যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অসংলগ্ন। সুনীতিবাবুর ODBL এর প্রথমখণ্ডের ৩৮৭-৪০১ পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত এ বিষয়ে

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে। [Umlaut ও Vowel harmony দ্রঃ] বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত শব্দের নানাপ্রকার স্বর পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোন প্রকার নিয়ম খুঁজিয়া পান নাই। সুনীতিবাবুর পুস্তকে স্তরে স্তরে সামঞ্জস্য সহকারে এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রকৃতি যে কতকগুলি অবিসম্বাদিত নীতির আশ্রয়েই প্রচলিত আছে তাহা দেখানো হইয়াছে। কতকগুলি অর্দ্ধতৎসমশব্দের প্রকৃতিবিশ্লেষণও ঠিক হয় নাই। কবির মতে 'পেরথোম' 'পেরধান' 'পেরজা' 'পেরসন্নো' 'পেরসাদ' [পৃঃ ৯১] প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে "একারের অকার তাড়ানো ঝোঁক আছে।" আসল কথা এই সমস্ত অর্দ্ধতৎসম শব্দ নানাপ্রকার লোকেরমুখে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার অন্তর্নিহিত কোনও নিয়ম নাই। তবে এই সমস্ত শব্দে একারের তেমন কোনও অকার বিরোধ নাই। "প্রথম" এই তৎসম শব্দটি হইতে 'পরথোম'ই একমাত্র অর্দ্ধতৎসম নহে, 'পরথোম'ও প্রচলিত আছে। "লাজরক্ত হৈল কন্যার পরথম যৌবন"। এইরূপ :—

প্রজা 7 পরজা, পেরজা, পেজ্জা ইত্যাদি
প্রসাদ 7 পরসাদ, পসাদ, পেরসাদ, পেসাদ ইত্যাদি
"বনবেতসের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ "রবীন্দ্রনাথ।
প্রসন্ন 7 পরসন্ন, পসন্ন, পেরসন্ন, পেসন্ন ইত্যাদি।
প্রধান 7 পরধান, পধান, পেরধান, পেধান ইত্যাদি।

(১২)

"ফ হচ্ছে f, ভ হচ্ছে v, চ হচ্ছে s।" [পৃঃ ৯৮]

বাঙ্গালাভাষার ফ ধ্বনি সংস্কৃত ফ ধ্বনির অনুরূপ। ইংরাজী "f" এ যে ধ্বনি আছে উহা অন্যপ্রকারের। "ফ" একটি স্পর্শধ্বনি (stop, explosive "f"), একটি ঘর্ষণজাত ধ্বনি (spirant, fricative), ফ=ph, f নহে। তবে অতি আধুনিক অর্ব্বাচীন উচ্চারণে কোন কোন স্থানে "ফ" এর উচ্চারণে "f" এর ঘেঁষ লাগে। এই উচ্চারণ অতি কৃত্রিম এবং অতি অধুনা ইংরাজীর প্রভাবে আসিয়াছে। অনেকে লেখেন Fani Vuson' =ফণিভূষণ, ভ কখনও v হচ্ছে না "চ" ও "স" হচ্ছে না।

(১৩)

"ণ" এর উচ্চারণ ড় এ চন্দ্রবিন্দুর মতো যেমন খাঁড়া, চাঁড়া, ভাঁড়ার"

[পৃঃ ১০১] চন্দ্রবিন্দু তো ড় এ দেখিতেছি না। এ তবে কিসের উদাহরণ কাহার ঘাড়ে চাপিল।

(১৪)

"এখানে বলা উচিত "যত" শব্দটার মধ্যে বিষ আছে। যত বাঁদর এক জায়গায় জুটেছে বললেই যথেষ্ট বলা হয়।"

[পৃঃ ১১৯] "যত" শব্দের এই একটি ছাড়া আরো প্রয়োগ আছে। আর এরূপস্থলে "যত" শব্দের মধ্যে বিষের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তুলনীয় "দেশে যত বিদ্বান্ আছেন সকলেই রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেন"। "যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এক জায়গায় জুটেছেন" বলিলেও বিষক্রিয়া দেখা দেয় না। উপরের বাক্যে "বাঁদর" থাকাতেই অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে।

(১৫)

"সম্বন্ধ কারকের চিহ্নে কর্ম্ম কারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষায় অমার্জ্জনীয় ঢিলেমি।"

[পৃঃ ১৩৭] চিহ্ন যে কারকের থাকুক, ভাষায় প্রসঙ্গতঃ যে অর্থ বোধ হয় তাহা দ্বারাই কারকের কাজ চলে। "হাতে মারে" বলিলে কেহ বুঝিবেন না "হাতের উপর নিয়ে মারে" কারণ "হাতে"র মধ্যে আছে সপ্তমীবিভক্তির "এ"। "হাতে মারে" বলিলে "হাত দিয়া" মারেই বোঝা যাইবে। "চা পানে অবসাদ দূর হয়" এখানে "চা পানে" অধিকরণের মত দেখিতে হইলেও অধিকরণ নহে, করণ (৩য়া)। অতি বিজ্ঞানসম্মত কারণেই বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃতের কারক বিভক্তিগুলি একে অপরের মধ্যে ধ্বনি বিপর্য্যয়ে মিশিয়া রহিয়াছে, অনেক সময়ে তাহাদের পরিচয় পাওয়া শক্ত বটে, কিন্তু তাহাতে ভাষার চলমানতার ব্যাঘাত ঘটে না। এক চেহারার হইলেও ভাষার সহিত যাহার পরিচয় আছে তাহার নিকট গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ বেশ ধরা পড়ে। হাতে মারে <সংস্কৃত হস্তেন মারয়তি 7 প্রাকৃত হত্থেন মারয়দি 7 হত্থেন মারয়ই 7 অপভ্রংশ হত্থে মারই 7 হাঁথে মারই 7 হাতে মারে।

(১৬)

"আমাদেরকে তোমাদের খাওয়াতে হবে" [পৃঃ ১৩৭]
"আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে।" [পৃঃ ১৩৭]

এইরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় দুষ্টপ্রয়োগ। "ফুলটি আমাদের দাও" "আমাদেরকে দাও" নয়। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তির স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইত উভয়বচনেই। এ প্রয়োগ তাহারই অনুগত।

(৮৭)

"তুই" "তোরা"—

"তোরার" শব্দ কোনও কোনও পূর্ব্ববঙ্গীয়ের মুখে শুনা যায়, সাহিত্যে বা প্রচলিত কথিতরূপে পাওয়া যায় না।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আয়তন অনুপাতে বারো আনা মূল্যও অকিঞ্চিৎকরই বলিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত পুস্তকের মূল্য অত্যন্ত বেশি হয়, এবং সাধারণে তাহা কিনিতে পারে না, এইরূপ একটা অভিযোগ শোনা যায়। আশা করা যাইতে পারে এইরূপ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা সুলভে প্রাপনীয় হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কিঞ্চিৎ অবসান ঘটিবে।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৷৶০+৬৩০। মূল্য—সাড়ে পাঁচ টাকা।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস বহুদিন ধরিয়া, ইতিহাসের ধারা বাহিয়া আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে নাই, ন্যূনাধিক মাত্র এক শত বৎসর কাল ইহার জীবন। আবির্ভাবের প্রাক্কালে ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাওয়ায় বাংলা উপন্যাস অতি সহজেই সুগঠিত রচনারীতির আদর্শ সম্মুখে পাইয়াছে এবং উপন্যাসকার জাগ্রত রসবোধ লইয়া সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। সেইজন্য প্রথম যুগেও বাংলা উপন্যাস বলিষ্ঠচরণেই চলিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার পর বেশী দিন গত হয় নাই; ইহার মধ্যেই কয়েকজন ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিকের সৃজন-প্রতিভায় বাংলা উপন্যাসের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে; আজও তাঁহাদের যথাযোগ্য বিচার হয় নাই। সাময়িক পত্রাদিতে স্তুতি অথবা নিন্দা দুই এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইয়া থাকে; কিন্তু সমালোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। পুস্তক আকারে উপন্যাস সমালোচনার প্রচেষ্টা দুই-চারি জন গ্রন্থকারকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বটে, তথাপি শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান গ্রন্থখানির ন্যায় আর কোনও পুস্তকই লিখিত হয় নাই। অতএব পথপ্রদর্শকের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ইহাকে ঠিক সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া না লইয়া রসবিচারমূলক দীর্ঘ-প্রবন্ধ সমষ্টি বলিয়া স্বীকার করিলে ইহার প্রতি সুবিচারের সম্ভাবনা বেশী হইতে পারে।" "বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।" সেইজন্য কেবলমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সমালোচনার সমষ্টি হিসাবেও আলোচ্য গ্রন্থখানির মূল্য সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু যে আকারে গ্রন্থখানি পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাতে উহাকে "বঙ্গসাহিত্যের একটা বিশেষ বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার" প্রথম উদ্যম হিসাবেই আমরা গ্রহণ করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ইতিহাস নিতান্ত অল্প দিনের। তথাপি মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে ইহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে গদ্য সাহিত্যের ভাষা ছিল না। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম কাব্যেই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সব রচনাবলীতে একটি সুসম্বদ্ধ আখ্যান সৃষ্টি করিবার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাস্তব জীবনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যে সব কাহিনী রচিত হয় তাহাই প্রকৃত উপন্যাস। এই দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস আধুনিক আবির্ভাব; ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার পর উহার জন্ম। বর্ত্তমানের সজীব উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম প্রাণস্পন্দন উপরোক্ত রচনাবলীতে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়; ইহাই কালক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তির সাধনার বলে বর্ত্তমানের পূর্ণাবয়ব উপন্যাস-রূপ ধারণ করিয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের সমাজে তৎকালে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল আজও তাহার স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। আরও দূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্বভাবতই আমাদের মনে হইবে আমরা নিজেদের সংস্কৃতির যে ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রায় অজানিতেই অপর এক সংস্কৃতির প্রভাবে আসিয়া পড়িয়াছি। আজ হয়ত আমাদের মনে ইহা পীড়া দেয় না; কিন্তু তৎকালে দুইটি বিভিন্নধর্ম্মী সংস্কৃতির সংঘাতে যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই সংঘাতেই আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈচিত্র্যহীন জীবনের বিধিবদ্ধ দৈনন্দিন আবর্ত্তনের মধ্যে ভাব-রাজ্যের এই অস্থিরতাই তখনকার ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যের উপাদান জোগাইয়াছে বলিলে অতিভাষণ দোষ ঘটিবে; কিন্তু এ কথা নিতান্ত সত্য যে এই দোটানাই তৎকালীন সাহিত্যিককে জীবনজিজ্ঞাসায় আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাস

সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে জীবনের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই হইবে। বাংলা উপন্যাস রচনার কোনও রীতি যদি তখনকার দিনে পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত থাকিত তাহা হইলে হয়ত কয়েকখানি উপন্যাসে তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যাইত। যাহা হউক ইহাই বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের জন্মকথার ইতিহাস। গ্রন্থকার আদি হইতে অতি-আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রায় সকল ঔপন্যাসিকের রচনা আলোচনা করিয়া বাংলা-উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইতেই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের আরম্ভ ধরিতে হইবে। তাঁহার রচনারম্ভের পূর্ব্বে কয়েকখানি উপন্যাসের অস্তিত্ব আমরা অবগত আছি। বিষয়বস্তু বা রচনারীতি কোনও দিক দিয়াই ঐ সব গ্রন্থের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই যাহা তাহাদিগকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলিয়া সমাদৃত করিতে পারে। উহাদের যা কিছু মূল্য তাহা প্রধানত ঐতিহাসিকের নিকটে। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাতন ইতিহাসের বিস্মৃতপৃষ্ঠা হইতে সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার কখনও নিজস্ব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার অমিত প্রতিভা বাস্তবরহিত কল্পলোকের ভিতর আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই, জীবন ধর্ম্মের সহিত কল্পনার সমন্বয় সাধন করিয়া প্রকৃত উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছে। রোমান্সপ্রবণ হইয়াও এই কারণে তাঁহার উপন্যাস সত্যের সন্ধান করিতে পারিয়াছে। রোমান্টিসিজ্‌মের একটি মোহ আছে। বুদ্ধি ও বস্তুর বন্ধন না থাকিলে নিছক্ রোমান্টিক সাহিত্য অনেক সময়েই তরল কল্পনা-বিলাসে পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যে সব অক্ষম সাহিত্যিক তাঁহার অনুকরণে রচনা করিতেন তাহা বুদ্ধি ও বস্তুর অভাবে রূপ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের পর একটি নবযুগের সূচনা করেন। পুরাতন ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তিনি উপন্যাস-সাহিত্যকে বাস্তব জীবনের দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, যদিও তাঁহার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। শরৎচন্দ্র বিষয় নির্ব্বাচনে ও রচনারীতির নূতনত্বে বাংলা-উপন্যাসের পরিধি আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক জীবনের চিরন্তন ঘাতপ্রতিঘাতের অনেক কাহিনী তিনি অনন্য-সাধারণ কৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন। এইখানে অগ্রবর্ত্তী সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ও তাহার বিশ্লেষণ, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রাঙ্কন ও এই সমাজের চরিত্র চিত্রণ তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। শরৎচন্দ্রের পর আধুনিক যুগের অনেক লেখক অসংখ্য উপন্যাস প্রতিনিয়ত

রচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা গ্রন্থখানিতে পাওয়া যাইবে।

ভাব ও প্রকাশভঙ্গি কোনও দিক দিয়াই পূর্ব্বতন লেখকদের সহিত অতি-আধুনিক লেখকদের সাদৃশ্য খুঁজিয়া-পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁহারা নিজেদের বাস্তবপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের রচনাতে বাস্তবজীবনের সংযোগ আবিষ্কার করা কঠিন। তাঁহাদের প্রকাশভঙ্গি কাব্যধর্ম্মী; এই উচ্ছল ভঙ্গিতে বাস্তবের রূঢ় সত্য প্রায়ই ধরা পড়ে না। চলতি ও সাধুভাষার বিতর্ক উপস্থিত না করিয়াও একথা বলা যায় যে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহাতে চলতি ভাষার গতি ও স্বাধীনতার একান্ত অভাব। তাঁহাদের পদগঠন-রীতি অত্যন্ত কৃত্রিম। সাহিত্য রচনায় কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার দোষের নহে একথা সত্য। সর্ব্বোপরি তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা তাঁহাদের সাহিত্যেই কেবলমাত্র চলতি, অন্যত্র নহে। এই মন্তব্য অতি-আধুনিক সকল লেখক সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য নহে একথা ঠিক। অতি-আধুনিক কালেও জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাহিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা এতই অল্প ও অপরগুলি এত প্রবল যে প্রবণতা বিচার করিলে মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গর্ব্বের বিষয় এই যে, মানব মনের সূক্ষ্ম ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত ও অনুভূতির গভীরতার সামান্য তারতম্যের প্রকাশ উহাতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের গল্প ও উপন্যাসের উপাদান কোন কোন ক্ষেত্রে কাল্পনিক হইলেও মনোবিকলনের কাব্যাশ্রয়ী ভাষায় প্রকাশ উল্লেখযোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকজন অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিককে তাঁহাদের প্রাপ্য এই সম্মান দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই।

আমাদের দেশ গুরুবাদের দেশ। যদিও আধুনিকতার প্রকাশ হিসাবে সর্ব্ববিষয়ে একটি উন্নাসিক ভাব কেহ কেহ দেখাইয়া থাকেন তথাপি অধিকাংশ লোকেরই শ্রদ্ধার আতিশয্যে বিচারবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। সাহিত্য বিচারেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সাহিত্যরসিকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কাহারও সম্বন্ধে অন্ধ ভক্তি প্রকাশ করা সমর্থনযোগ্য নহে। প্রতিভাবান সাহিত্যিকমাত্রেরই মৌলিকতা আছে; সাহিত্যের দরবারে তাঁহারা স্বকীয় মৌলিকতার দাবীতেই নিজ নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কেবলমাত্র রসবিচারই গ্রন্থকারের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। দুই জন লেখকের বর্ণিত বিষয়ে যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানেও তিনি রসগ্রাহীর স্বভাবসিদ্ধ ব্যক্তিনির্ব্বিশেষ আসক্তিতে তুলনা-মূলক বিচার করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সকল ঔপন্যাসিকের রচনা বিস্তৃত

আলোচনা করিয়া তিনি রসাস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমালোচনার ইহাই রীতি। গ্রন্থকার প্রথিতযশা লেখকদের রচনারীতি ও কলাকৌশল মাত্র আলোচনা করেন নাই, তাহাদের প্রধানতম উপন্যাসগুলি ও তদ্বর্ণিত চরিত্রাবলী বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমালোচনা-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইয়াছে। পাঠকের রসবোধ জাগ্রত করাই সমালোচনার প্রধান কর্তব্য। এই দিক দিয়া গ্রন্থখানি সার্থক হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ নিপুণতায় আকৃষ্ট হইয়া স্বাধীন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।

উপন্যাস সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানির কিছু ত্রুটি আছে। পুস্তকের আকার হইতে বিভিন্ন লেখকের রচনারীতির যতখানি পরিচয় আশা করা যায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহা পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আলোচনায় পুস্তকের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহাদের রচনার সম্যক আলোচনার পক্ষে ইহাও পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা স্বীকার্য। তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া অন্যান্য লেখকের প্রতি সুবিচারের জন্যই তাঁহার আলোচনা আরও একটু সংক্ষিপ্ত করিলে দোষের হইত না। অতি-আধুনিক উপন্যাসের আরও পরিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থটির বর্ত্তমান সীমার মধ্যেই সম্ভব ছিল। 'স্ত্রী'-ঔপন্যাসিকদের মত অন্যান্য লেখকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের রচনার ন্যায্য সমালোচনা দাবী করিতে পারেন। বঙ্গসাহিত্যের যে সামান্য কয়েকজন মহিলা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের রচনা আলোচনার জন্য এই মূল্যবান পুস্তকটির এক শত দশ পৃষ্ঠা ব্যয় সমর্থন করা যায় না।

মাসিক পত্রিকায় ক্রমপর্য্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া সমগ্রভাবে পুস্তকটির কোনও রূপ পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। ফলে দুই চারিটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও দুই চারি জন ঔপন্যাসিকের সমালোচনা করাই ঘটিয়া উঠে নাই। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সচেতন, দুই স্থলে গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু বিচার বা বিশ্লেষণ করা হয় নাই। 'স্বর্ণলতা'র ভ্রাতৃবিরোধের উল্লেখ না করিলেও চলে, কিন্তু 'গড়াচরচন্দ্র'ও 'নীলকমলে'র পরিচয় না দেওয়া আলোচ্য পুস্তকের একটি দুরপনেয় ত্রুটি। এককালে এই পুস্তকখানি কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন। 'রহস্যলহরী' সিরিজ্ প্রকাশের পাপের জন্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রাম্য চিত্রের তিনখানি উপন্যাসই অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাঁহার নাম পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে এবং মাত্র দুই এক লাইনে তাঁহার গ্রাম্যচিত্রাঙ্কন বাস্তব ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অতি-

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্থান আছে। তাঁহার রচিত 'সত্যাসত্য' সাহিত্যানুরাগীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। গ্রন্থকার ভূমিকায় তাঁহার পুস্তকের ঈদৃশ অপূর্ণতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই "তালিকা দীর্ঘতর করিয়া কোনও লাভ নাই।"

এই ধরণের গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির হইতে বহু সময় অতিবাহিত হইবে হয়ত। নব-সংস্করণে এই সব ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা হইবে ইহাই আমরা আশা করি।

গ্রন্থকার বহুদিন ধরিয়া ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করিতেছেন এবং রচনাদি ইংরাজী ভাষাতেই করিয়া থাকেন তাহা তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়। স্থলবিশেষে প্রকাশভঙ্গি ইংরাজী রীতি অনুসরণ করিয়াছে। তাহাতে সর্ব্বত্রই ফল ভাল হইয়াছে বলা যায় না। উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন, যে কোন পাঠকেরই ইহা চোখে পড়িবে। ইহা ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ শক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস

শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর সেন কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত এবং দিলীপকুমার সান্যাল কর্তৃক, ৬ বি, বকুল বাগান রো, ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত।